প্রথম প্রকাশ

শুভ ১লা বৈশাখ | ১৩৬১

প্রকাশিকা

শুক্লা দে

শ্রী প্রকাশ ভবন

১৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলকাতা ১২

চিত্রশিল্পী

চারু খান

মুদ্রক

গণদেব মল্লিক

ইণ্টারন্যাশনাল প্রিন্টিং

১৬৮ বিধান সরণী

কলকাতা ৬

তিন টাকা



সকলের রামকৃষ্ণ

সূচী

কুশলকুমার

কল্যাণীয়েষু-কে

দিলাম



পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ

বাংলা বারোশো বিয়াল্লিস সালের ছয়ুই ফাল্গুন, ইংরেজী আঠারো শো ছত্রিশ খৃষ্টাব্দের সতেরোই ফেব্রুয়ারী, বুধবার, ব্রাহ্মমুহূর্তে আবির্ভূত হলেন রামকৃষ্ণ।

বাপ ক্ষুদিরাম। মা চন্দ্রমণি। থাকেন কামারপুকুরে, হুগলী জেলার ছোট্ট অখ্যাত পল্লীতে।

রামকৃষ্ণ জন্ম নিলেন ঢেঁকিশালে। কিন্তু, এ কি, ছেলে কই? ধাই ধনী কামারণী চেঁচিয়ে উঠলো। দেখা দিয়েই অন্তর্হিত হয়ে গেলো নাকি?

ও মা, দেখেছো? পিছল মাটিতে হড়কে হড়কে ধানসেদ্ধর উনুনের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে। উনুনে আগুন নেই এখন, কিন্তু ছাই আছে গাদা করা। ছেলেকে কোলে টেনে নিলো ধনী। ছাই-মাখা ছেলে। ভাস্বর ভস্মভূষণ।

গয়ায় গিয়ে ক্ষুদিরাম স্বপ্ন দেখেছিলেন, গদাধর তাঁর ঘরে পুত্র হয়ে আসবে, তাই ছেলের নাম রাখলেন গদাধর। ডাক নাম গদাই।

বড়ো-সড়ো হয়ে উঠেছে গদাধর। চন্দ্রমণি তাকে নতুন ধুতি দিয়েছেন। ফালা ফালা করে গদাধর তা ছিঁড়ে ফেলেছে। এক ফালা নিয়ে দিব্যি পরেছে ডোর কপনি করে।

'এ কি, এ তুই কী হয়েছিস?' চন্দ্রমণি আঁৎকে উঠলেন।

'অতিথি হয়েছি।'

'অতিথি? সে আবার কী?'

বুঝিয়ে দিলো গদাধর: 'লাহাবাবুদের অতিথিশালায় যারা আসে তাদেরকে অতিথি বলে না?'

'তারা তো সব সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর বেশ তুই পছন্দ করলি?' মার মন ছ্যাঁৎ করে উঠলো। 'আস্ত কাপড় দিলাম, তা ছিঁড়ে কৌপীন বানালি!'

পাঁচ বছরের ছেলে গদাধর, পাততাড়ি বগলে করে ঢুকলো পাঠশালায়।

শুভঙ্করীটাই গোলমেলে। দু'চক্ষে ওটা দেখতে পারে না গদাধর। তারপর কষ্টেসৃষ্টে যোগ যদি বা হলো, বিয়োগ কিছুতেই বাগে আনতে পারলো না।

কী করেই বা পারবে? যোগে আছে সর্বক্ষণ, তাই যোগ করায়ত্ত। কিন্তু বিয়োগ আবার কী! কোথাও লয়-ক্ষয় নেই, বিয়োগ-বিচ্ছেদ নেই। কিছু থেকে কিছুই এখানে বাদ যায় না।

তার চেয়ে প্রহ্লাদ-চরিত্র পড়তে দাও, মাথুর গাইতে দাও, সবাইকে মাতিয়ে দেবে গদাধর। শিবরাত্রিতে পাইনদের বাড়িতে যাত্রা হবে, কিন্তু শিব যে সাজবে সে ছোঁড়ার দেখা নেই। যাত্রা বন্ধ হলে রাত্রি জাগরণ হয় না, সবাই ধরাধরি করে গদাধরকে শিব সাজিয়ে নামিয়ে দিলো আসরে।

বালক গদাধর কোথায়, অবিকল শিব। মাথায় রুক্ষবর্ণ জটাভার,

গায়ে বিভূতির আচ্ছাদন। এক হাতে শিঙা অন্য হাতে ত্রিশূল। কণ্ঠে ও বাহুতে নাগ খেলা করছে ফণা তুলে, শেখরে খেলা করছে শশধর।

অভাবনীয় আনন্দের ঢেউ খেলে গেলো চারিদিকে। মেয়েরা উলু দিয়ে উঠলো। কেউ কেউ শাঁখ বাজালো। হরিধ্বনি করে উঠলো পুরুষেরা। স্বয়ং অধিকারী শিবস্তুতি শুরু করলেন।

ধানক্ষেতের সরু আল ধরে চলেছে গদাধর। কোঁচড়ে মুড়ি, তাই তুলে তুলে চিবুচ্ছে থেকে থেকে। আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে, তাকালো চোখ তুলে। দেখলো, এক ঝাঁক সাদা বক সেই কালো মেঘের গা ঘেঁষে উড়ে যাচ্ছে দূরে দূরান্তরে। কালোয় আর সাদায় এক দিব্য কাব্য রচিত হয়েছে আকাশের বুকে। গদাধরের সারা শরীরে শিহরণ জাগলো। প্রাণ-মন উড়ে চললো পাখা মেলে। দেহ পিঞ্জর লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। এই প্রথম ভাব সমাধি গদাধরের।

সাত পেরিয়ে আটে পড়েছে, পৈতে দিতে হয় ছেলেটাকে। দাদারা কোমর বেঁধেছেন।

পৈতে তো হলো, কিন্তু ভিক্ষে দেবে কে? গদাধর গোঁ ধরলো, 'ধনী কামারণী ছাড়া আর কারুর হাতে ভিক্ষে নেবো না।'

সে কি কথা! ধনী ছোটো জাতের মেয়ে, সে কী করে ভিক্ষে দেবে? কুলাচার লঙ্ঘন হয়ে যাবে যে!

কিসের কুলাচার? কিসের জাত-বেজাত? প্রাণ চাইছে ধনীকে মা বলবো, তার কাছে কোনো বিধিনিষেধ মানবো না। তোমরা তোমাদের বামনাই নিয়ে থাকো, আমি না খেয়ে উপোস করে থাকবো। এই খিল দিলাম দরজায়।

কতো জনের কতো কাকুতি-মিনতি, তবু দরজা খোলে না গদাধর। বালক অথচ বিপ্লবী গদাধর।

শেষকালে বড়দা রামকুমার বললেন, 'বেশ, ধনী কামারণীই ভিক্ষে দেবে। খোল্ দরজা। কুলাচার নষ্ট হয় হোক, তবু তোকে উপোসী দেখতে পারবো না।'

দরজা খুলে দিলো গদাধর।

গ্রামে বিশেষ লেখাপড়া হচ্ছে না, গদাধরকে তাই কলকাতায় নিয়ে এসেছেন রামকুমার। নিজে পুরোতগিরি করে বিশেষ উপার্জন করতে পারছেন না, তাই টোল খুলেছেন। ইচ্ছে গদাধরকে সেই টোলে ভর্তি করে দেন।

'এবার একটু লেখাপড়া কর্।'

'লেখাপড়া?' গদাধর সরল চোখে তাকিয়ে রইলো।

'হ্যাঁ, এবার বাড়ি গিয়ে দেখলাম লেখাপড়ায় তোর একেবারে মন নেই। পাড়ার ছোঁড়াদের সঙ্গে গাঁ-ময় ঘুরে বেড়াস, নয়তো যাত্রাদলে গিয়ে শিব সাজিস। ও-সবে পেট ভরবে না। লেখাপড়া করতে হবে।'

'কিন্তু শিখবো কী?'

'শাস্ত্র—ব্যাকরণ—'

'দাদা, চাল-কলা বাঁধা বিদ্যে শিখে আমার কী হবে?'

'তার মানে?'

'অর্থকরী বিদ্যে, ঘর সাজানো বিদ্যে আমি চাই না।'

'তবে তুই কী চাস্?'

'আমি চাই জ্ঞান।'

'সে আবার কী?'

'এক জানার নাম জ্ঞান, আর অনেক জানার নামও জ্ঞান।' বললে গদাধর, 'যদি জানতে হয় আমি সেই এক—পরমেশ্বরকেই জানবো।'

রাসমণির কালীমন্দিরে, দক্ষিণেশ্বরে, ঠাঁই পেলো গদাধর।



মাতৃভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ

মাকে ঠাকুর নিয়ে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের দুই মা। ঘরের মা চন্দ্রমণি আর বিশ্বের মা ভবতারিণী। ঘরের মা থাকেন ঘরে, আর বিশ্বের মা মন্দিরে।

ঘরই মন্দির, মন্দিরই ঘর।

ঘরের মাকে তিনি মহিমান্বিত করেন জগজ্জননীতে, আবার জগজ্জননীকে রূপান্তরিত করেন ঘরের মায়ে। যিনি প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের মুকুট পরে রাজেন্দ্রাণী সেজেছেন তিনিই আবার রুগ্ন সন্তানের শিয়রে দীনবাস ম্লানমুখী বিনিদ্র জননী।

ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে চন্দ্রমণিকে প্রণাম করেন। তারপরে ভবতারিণীর দুয়ারে। আগে ধারিণী, তারপরে তারিণী।

'কোথায় তোরা ঈশ্বরকে খুঁজে বেড়াচ্ছিস কোন্ গহন কাননে, কোন্ পথে-পর্বতে?' ঠাকুর ডেকে বললেন বিশ্বজনকে: 'ঈশ্বর তোর ঘরে

তোর সংসারেই বিরাজ করছেন। শুধু ভাবের ঈশ্বর নয়, জীবন্ত ঈশ্বর! অজানা ঈশ্বর নয়, অন্তরঙ্গ ঈশ্বর। নির্বাক বধির ঈশ্বর নয়, দয়াময় দ্রব্যময় ঈশ্বর! সে ঈশ্বর তোর বাপ-মা।

তোর সীতা-রাম। তোর হর-গৌরী। তোর লক্ষ্মী-নারায়ণ। তোর আদিত্য আর চন্দ্রমা।

'বাপ-মা কতো বড়ো বস্তু।' বললেন ঠাকুর, 'বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে যে ধর্ম করবে তার ছাই হবে।'

যখন তোতাপুরী এলো দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুরকে দেখে লাফিয়ে উঠলো। বেদান্ত-সাধনের এই তো যোগ্য লোক। বেদান্ত সাধন মানে ভাবাতীত অরূপের সাধন। নির্বিকল্প সমাধি।

'সাধন-ভজন কিছু করবে?' জিগ্যেস করলো তোতাপুরী।

'তার আমি কি জানি!' সরল চোখে তাকিয়ে রইলেন রামকৃষ্ণ।

'তুমি কী জানো মানে! তবে কে জানে?'

'আমার মা জানে।'

এ আবার কি রকম কথা! কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করলো তোতাপুরী, 'কে তোমার মা? কোথায়?'

'ঐ যে, মন্দিরে পাষাণময়ী আছে, ঐ আমার মা।' ভবতারিণীর প্রতি ইঙ্গিত করলেন রামকৃষ্ণ।

'তবে যাও, তাঁর মত নিয়ে এসো।'

ভবতারিণী আদেশ দিলেন। কিন্তু আরেক মা আছেন। তাঁরও মুখের দিকে চাইতে হবে। তাঁর কথাও ভুলতে পারছেন না রামকৃষ্ণ।

শিখা-সূত্র ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিতে হবে, এই হচ্ছে তোতাপুরীর সাধনা। পরতে হবে গেরুয়া। নাম বদলাতে হবে, পদবী বদলাতে হবে। ছিন্ন করতে হবে জাগতিক সম্পর্ক। ত্যাগ করতে হবে সাংসারিক পরিচয়।

'সব করবো, কিন্তু গোপনে।'

'গোপনে কেন?' আশ্চর্য হলো তোতাপুরী।

'সব ত্যাগ করতে পারবো কিন্তু মাকে ছাড়া। আমার দুই মা। মন্দিরে যে পাষাণময়ী ঘরে সেই করুণাময়ী'—ভাবের লাবণ্যে রামকৃষ্ণের চোখ ছলছল করে উঠলো।

যেন সবটা বুঝতে পারলো না তোতাপুরী।

রামকৃষ্ণ বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, 'আমার মা, আমার ঘরের মা, বছরখানেক হলো আছেন আমার সঙ্গে। যদি দেখেন সন্ন্যাস নিয়েছি, দুঃখে তাঁর বুক ফেটে যাবে।'

এক মা বলেন, সন্ন্যাস নে। আরেক মা বলেন, তোর সোনার অঙ্গে ভস্ম দেখলে সইতে পারবো না।

নিষ্কাম ছেলের নির্লোভ মা এই চন্দ্রমণি।

রামকৃষ্ণকে বিষয় দিতে চেয়েছিলেন মথুরবাবু, রামকৃষ্ণ অবহেলায় ছুঁড়ে দিয়েছেন। শাল দিয়েছিলেন গায়ে, গায়ের শাল ধুলোয় ফেলে দিয়েছেন। তাঁর মা চন্দ্রমণিকে ভজাতে এলেন এবার। বললেন, 'আচ্ছা ঠাকুমা, তুমি তো কোনো সেবা নিলে না আমার থেকে?'

'আমার অভাব কিসের?' খুশি মুখে বললেন চন্দ্রমণি।

'তবু কিছু তুমি আমার কাছ থেকে নাও—এই বড়ো ইচ্ছে। কিছু নাও না চেয়ে।'

'কী চাইবো? খাবার-পরবার এতোটুকু কষ্টও তো রাখোনি।'

তবু পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন মথুরবাবু। তোমার তো নেবার প্রার্থনা নয়, আমার শুধু দেবার ব্যাকুলতা।

'যা মন চায় একটা কিছু নাও না।'

'যদি নেহাৎই কিছু দেবে, আমাকে চার পয়সার দোক্তা কিনে দাও।'

চার টাকা নয়, চার আনা নয়, চার পয়সার দোক্তা!

মা এমন লোভশূন্য বলেই তো ছেলে এমন সর্বজয়ী। অমন বৃহদ্‌ব্রত ব্রহ্মচারী। নির্বাসনাই তো সন্তোষ। সর্বদুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি।

কথা রাখলো তোতাপুরী। চন্দ্রমণির চোখের আড়ালে সন্ন্যাস দিলো রামকৃষ্ণকে। সাঙ্গ করলো বিরজা হোম।

কিন্তু বেশীদিন কাষায়-কৌপীন পরেননি রামকৃষ্ণ। পাছে মার চোখে পড়ে। পাছে মা আঁচলে মুখ লুকিয়ে কাঁদেন অনুপায়ের মতো।

শুধু তাই? খালি গায়ের ওপরে কোঁচার খুঁটটি কেন তুলে দিয়েছেন রামকৃষ্ণ? যে মুক্তসমস্তসঙ্গ তাঁর গায়ের ওপরে ভদ্রতার ঢাকা কেন?

ওটি মার জন্যে। গলার পৈতে ফেলে দিয়েছেন এ বুঝতে পেলে মা ধুলিশয্যা নেবেন। তাই মার চোখে যাতে ধরা না পড়েন তারই জন্যে এই একটু ছদ্মধারণ। যাই বলো, সব সইতে পারবো, মার চোখের জল সইতে পারবো না।

প্রতাপ হাজরা দক্ষিণেশ্বরে এসেছে ঠাকুরের সংস্পর্শে থেকে সাধন করতে। কিন্তু তার বুড়ো মা দেশের বাড়ি থেকে খবর পাঠিয়েছে—তার মরণাপন্ন অসুখ, প্রতাপ যেন একবার দেখে যায়।

'বুড়ো মা, একবার দেখা দিয়ে এসো।' অনুনয় করলেন ঠাকুর।

প্রতাপ পাথর হয়ে রইলো। বললো, 'ঈশ্বরসাধন করতে এসে পিছটান ভালো নয়।'

'পিছটান কিরে? মার সর্ব-টান। দশদিক থেকেই মা। দশ-দিকে দশ বিদ্যা।'

তবু নড়লো না প্রতাপ। তার মা কেঁদে কেঁদে মরে গেলো।

'এবারে হাজরা দেশে যাবে।' নরেন এসে বললো ঠাকুরকে।

'এখন দেশে যাবে! দূর—দূর—' ছি ছি করে উঠলেন ঠাকুর। 'বাপ-মা কতোবড়ো গুরু! রাখাল আমায় জিগ্যেস করে, বাবার পাতে কি খাবো? আমি বলি, সে কি রে? তোর কি হয়েছে যে, তোর বাবার পাতে খাবি না?'

একজন রামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলো, 'বাপ-মা যদি কোনো অপরাধ করে থাকেন—'

'তা হোক। তবুও ত্যাগ করা চলবে না। অমুক গুরু খারাপ বলে কথা হলো তার ছেলেকে গুরু করা যাক। আমি বললুম, সে কি গো? ওলকে ছেড়ে ওলের মুলি নেবে? নষ্ট হলো তো কি? নষ্টকেই ইষ্ট

বলে জেনো। যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি-বাড়ি যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।'

মা-বাপ কি কম জিনিস? তাঁরা প্রসন্ন না হলে ধর্মটর্ম কিছুই হয় না। চৈতন্যদেব তো প্রেমে উন্মত্ত, তবুও সন্ন্যাসের আগে কতোদিন মাকে বোঝান, বলেন, মা, আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দিয়ে যাবো।

বৃন্দাবনে এসেছেন রামকৃষ্ণ। এইখানে গঙ্গাময়ীর সঙ্গে দেখা।

নিধুবনের কাছে কুটির বেঁধে একলাটি থাকে গঙ্গাময়ী। ষাট বছর বয়স, তা হোক, ললিতাসখী হয়ে রাধিকাভজন করে।

পরস্পরকে দেখে চিনে ফেললো দু'জনে। রামকৃষ্ণ বললেন, 'তুমি ললিতা।' গঙ্গাময়ী বললো, 'আর তুমি রাধিকা ভাবভক্তিবিনোদিনী।'

রামকৃষ্ণ ঠিক করলেন দক্ষিণেশ্বরে আর ফিরবেন না। বাকী জীবন এই ব্রজধামেই কাটিয়ে দেবেন। কাটিয়ে দেবেন গঙ্গাময়ীর স্নেহাশ্রমে।

মথুরবাবু প্রমাদ গুণলেন। দক্ষিণেশ্বর কি অন্ধকার হয়ে যাবে? যিনি নিজে সুদক্ষিণ তিনি কি পরাঙ্মুখ হয়ে থাকবেন? হৃদয়কে বললেন, 'এখন ব্যবস্থা করো।'

হৃদয় অনেক সাধ্যসাধনা করলো, কিন্তু কিছুতেই নরম হলেন না রামকৃষ্ণ। এখানে এমন মধুবনচারিণী যমুনা, এমন পরম পবিত্র লীলাধাম, এ ছেড়ে আমি পাদমেকং ন গচ্ছামি।

হৃদয় ধমকে উঠলো, 'তোমার এতো পেটের অসুখ, তোমাকে এখানে দেখবে কে?'

'কেন, আমি দেখবো সেবা করবো।' বলে উঠলো গঙ্গাময়ী।

কিছুতেই কিছু হবার নয়। বাইরের যুক্তিতর্কের কোনো ধার ধারবেন না রামকৃষ্ণ। অন্তরে যে ভাবটি এসেছে সেইটির পূরণ চাই।

গায়ের জোর ছাড়া আর পথ নেই। মহাবীর হনুমানের মতোই দুর্ধর্ষ সেবক এই হৃদয়রাম, তেমনি দুর্দান্ত তার শক্তি। সে ঠাকুরের হাত চেপে ধরলো। বললে, 'ওসব চলবেনা চালাকি। ওঠো, চলো।'

গঙ্গাময়ীও চেপে ধরলো আরেক হাত। বললো, 'কখনো না। কিছুতেই যেতে দেবো না। তুমি পারবে গায়ের জোরে?'

ঠাকুরের সমস্ত জোর গঙ্গাময়ীর দিকে। তাই তাঁকে টলায় হৃদয়ের সাধ্য কি। দু'জনের টানাটানিতে ঠাকুরের হয়রানি। যেন সাতেও নেই পাঁচেও নেই এমনি ভাব। দু'জনের হাতে দু'হাত ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, যে পারো রাখো, যে পারো টেনে নাও।

হৃদয়ের গর্ব চূর্ণ হলো। ঠাকুর সুমেরুর মতো অটল।

এখন উপায় কি?

উপায় মা। উপায় চন্দ্রমণি।

মার মুখখানি হঠাৎ মনে পড়ে গেলো রামকৃষ্ণের। স্নেহলাবণ্যময় কোমল করুণ মুখখানি। ব্যস্ত হয়ে ঘর-বার করছেন। উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দুয়ার ধরে। দিনান্ত হয়ে গেলো, ছেলে এখনো ফিরলো না। জল ছলছল চোখে জিগ্যেস করছেন পথচলা পথিককে, আমার গদাইকে দেখেছো কোথাও? নিশীথ রাতে উঠে পড়েছেন ঘুম থেকে। আতঙ্কিত অন্ধকারকে শুধোচ্ছেন শূন্য স্বরে, আমার গদাই কোথায় গেলো?

মার সেই উদ্বেগচঞ্চল চক্ষু দু'টি। সেই মার ভীত চমকিত ব্যাকুলতা।

মনস্থির করতে আর দেরী হলো না রামকৃষ্ণের। উড়ে গেলো সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। পড়ে রইলো বৃন্দাবন। পড়ে রইলো গঙ্গাময়ী। পড়ে রইলো নীল যমুনা। নিমেষে গঙ্গাময়ীর হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'চল্, মার কাছে ফিরে যাই।'

মার মতো কেউ নয়। মার বড়ো কেউ নেই।

সকল তীর্থের সার, সকল তীর্থের উর্ধ্বে মা। মা স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী।

'টানাটানিতে মার কথা মনে পড়ে গেলো।' বললেন ঠাকুর 'অমনি বদলে গেলো সমস্ত। ভাবলুম মা বুড়ো হয়েছেন, মার চিন্তা থাকলে ঈশ্বর-ফিশ্বর সব ঘুরে যাবে। তার চেয়ে তাঁর কাছেই যাই। গিয়ে সেখানেই নিশ্চিন্ত হয়ে ঈশ্বরচিন্তা করি।'

মার মাঝেই ত্রিভুবন। মাকে প্রদক্ষিণ করলেই হলো।

অহেতুক কৃপা চাই ঈশ্বরের। কিন্তু শুধুই চাই, বিনিময়ে কিছু দেবো না ঈশ্বরকে? দেবো বৈ কি। কিন্তু কি দিতে পারি? দেবার মতো আমার কী আছে? আছে, এক অমূল্য সম্পদ আছে। শুধু আমার নয়, সকলের আছে। পৃথিবীতে যে দীনতম হীনতম তারও আছে। অহেতুক কৃপার বদলে দেবো অহেতুক ভালোবাসা। ভালোবাসা কার নেই? কে এমন আছে সংসারে যে ভালোবাসতে পারে না? আর কাউকে না হোক, অন্তত নিজেকে ভালোবাসে? ঈশ্বরকে দেবো সেই ভালোবাসা। কিছু চাই না তবু ভালোবাসি। কিছু পাই না তবু ভালোবাসি। দেবো সেই অকারণ ভালোবাসা। সেই অকারণ ভালো-বাসার বদলে পাবো তোমার অবারণ করুণা।

ঈশ্বরের উপর যাতে এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আসে তারই জন্য ঠাকুরের মাতৃসাধনা। মাকে ভাবতেই মন ভরে ওঠে, চোখে জল আসে, প্রাণ আনচান করে। সন্তান ভালোবাসবার আগে মাকে জিগ্যেস করে না, মা তুমি কি রূপসী, বা, তুমি কি বিদুষী, বা, তোমার ক্যাশবাক্সে কতো টাকা আছে, বা, তোমার স্বামী কি চাকরি করে? তার মা আছে এই তার ঐশ্বর্য। তার মা আছে এই তার ভুবনজোড়া শান্তি।

মার অনন্ত ক্ষমা, অনন্ত দয়া, অনন্ত সহিষ্ণুতা।

মা কখনোও পুরোনো হয় না। মা নামের জরা-মৃত্যু নেই। মা-নামের আকার দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত। মা-নামের বাণী নির্মল মুক্তির নির্ঝরিণী।

দুঃখেও মা-নাম, আনন্দেও মা-নাম। মা সর্বসম্পৎস্বরূপা।

মা সর্বংসহা ধরিত্রী। ধান্যদা, ধনদায়িনী।

'কী হবি? ধ্রুব হবি না প্রহ্লাদ হবি?' জিগ্যেস করলেন ঠাকুর: 'ধ্রুব বড়ো না প্রহ্লাদ বড়ো?'

হৃতরাজ্য উদ্ধারের জন্য ধ্রুব তপস্যা করেছিলো। কাঁচ কুড়োতে এসে মণি পেয়ে গেলো। কিন্তু প্রহ্লাদের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই।

ঈশ্বরকে কেন ডাকছে তাও জানে না। ডাকতে ভালো লাগছে বলেই ডেকে যাচ্ছে। হাতীর পায়ের তলায় ফেলছে, তাতেও ঈশ্বর। তপ্ত তেলের কটাহে ফেলছে তাতেও ঈশ্বর। মুক্তি চাই না, সিদ্ধি চাই না, শুধু তোমাকে ভালোবাসতে চাই।

কি চায় ছেলে তা ছেলে জানে না, তার মা জানে। ছেলের শুধু মা-মা বলে কেঁদে যাবার কথা। মা এসে বিচার করবেন কোথায় ছেলের উপশম। আর কিছু না দিন যদি তাঁর উত্তপ্ত উৎসঙ্গটুকু পাই সেই আমার জগজ্জয়।

'মা একটা পয়সা দে।' ছেলে কাঁদছে মার কাছে। 'ঘুড়ি কিনবো।'

মা বললে, 'না, উনি বারণ করে গেছেন—'

তবু ছেলের কান্নার বিরাম নেই। শত বারণ ধুয়ে যাচ্ছে সে কান্নার ব্যাকুলতায়। অন্য মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছে মা। ছেলের কান্না কানে তুলছে না। ততোই ছেলে টানছে আঁচল ধরে। বলছে, 'শুধু একটা পয়সা। ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়াবো।'

'এক্ষুনি একটা কাণ্ড বাধাবি আর কি।' মা ধমক দিয়ে উঠলেন।

কিছুতেই নিরস্ত হবার নয়। আবার কান্না। আবার আঁচল টানা।

'রোসো গো, ছেলেটাকে শান্ত করে আসি।' পাড়ার মেয়েদের বসতে বলে ঘরের মধ্যে চলে আসে মা। বাক্স খুলে একটা পয়সা ফেলে দেয় ছেলেকে।

তেমনি ছাড়ানছোড়ান নেই। কৃপার পয়সাটি ফেলে দাও বাক্স থেকে। প্রাণের সুতোয় সচ্চিদানন্দের ঘুড়ি ওড়াবো।

'বাপ-মা পরমগুরু।' বললেন রামকৃষ্ণ: 'কেবল ঈশ্বরের জন্যে বাপ-মার আদেশ লঙ্ঘন করা চলে—আর কিছুতে নয়। বাপের কথায় প্রহ্লাদ ছাড়েনি কৃষ্ণনাম। মা বারণ করলেও ধ্রুব তপস্যা করতে বনে গিয়েছিলো। কৈকেয়ীর কথায় ভরত ছাড়েনি রামসেবা। রামের জন্যে রাবণের কথা শোনেনি বিভীষণ। ভগবানের জন্যে বলি তার গুরু শুক্রচার্যকে অমান্য করেছে—'

নইলে বাপ-মা যা বলবেন তাই বেদবাক্য। তাই শিরোধার্য।

চন্দ্রমণি মাঝে মাঝে রেঁধে দেন রামকৃষ্ণকে।

'তুমি মা দেশের মতন করে বেশ ফোড়ন-টোড়ন দিয়ে দুটো একটা তরকারি করোনা। খেতে বড়ো মন চায়।'

রেঁধে দেন চন্দ্রমণি। তরকারিতে এমন একটি ফোড়ন দেন, যা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। সেটির নাম মাতৃস্নেহ।

মার কাছটিতে বসে খান রামকৃষ্ণ। এমন একটি আস্বাদ পান যা রান্নার মধ্যে নেই। আছে তাঁর অন্তরের মধ্যে। সেটির নাম মাতৃভক্তি।

শেষের দিকে কেমন জবুথবু হয়ে পড়লেন চন্দ্রমণি। জরায় আচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগলেন। তবু তাঁকে আঁকড়ে রইলেন ঠাকুর।

বাইরে জরা কিন্তু অন্তরে সেই ঋদ্ধিশালিনী মহালক্ষ্মী।

আলমবাজারের চটকলের বাঁশি না বাজলে চন্দ্রমণি খেতে বসেন না। সেই বাঁশি বাজলে বলে ওঠেন, 'ঐ বৈকুণ্ঠের বাঁশি বাজলো। লক্ষ্মী-নারায়ণের ভোগ হলো এতোক্ষণে।'

রবিবার তাঁকে নিয়ে বড়ো বিপদ। সেদিন কলের ছুটি, বাঁশি নেই। সেদিন কিছুতেই খাবেন না চন্দ্রমণি। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী-নারায়ণ উপোস করে থাকলো আর আমি ভাত খাবো? এ কখনো হতে পারে?

মাকে নিয়ে ঠাকুরের মহা ভাবনা।

এখন উদ্ধারের পথ কি? আহা, বুড়োমানুষ, শরীর বেজায় কাহিল হয়ে পড়বে যে।

'মা এইবেলা খেয়ে নাও, রাধাকান্তের পেসাদ।' মার কাছে গিয়ে অনুনয় করেন ঠাকুর।

সরলা বালিকার মতো বলেন চন্দ্রমণি: 'কি করে খাই বলো? লক্ষ্মী-নারায়ণের যে এখনো ভোগ হয়নি।'

হৃদয় বললো, 'তুমি মামা, অতো ভেবোনি। বুড়ির খিদে পেলে আপনিই খাবে।'

'না রে দেখতে হয়। খাওয়াতে হয় ভুলিয়ে-ভালিয়ে।'

তখন হৃদয় জলের জালার মধ্যে চোঙা ঢুকিয়ে বাঁশির আওয়াজ করলো। বললো, 'এই নাও তোমার বাঁশি বাজলো। এবারে খাও।'

এদিকে জরা, কিন্তু বুদ্ধি টনটনে। বললেন চন্দ্রমণি, 'না রে। ও তো শুধু চোঙে শব্দ করছিস।'

তখন সকলের হাসি।

ঠাকুর তখন মার গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন। বললেন, 'দেখো মা, আজকাল গঙ্গায় বড়ো বড়ো সব জাহাজ চলে। তার অনবরত শব্দ হচ্ছে। আর যা জোর হাওয়া! তাই বাঁশির আওয়াজ হয়তো তুমি শুনতে পাওনি আজ।'

'তাই হবে হয়তো।' তখন ঠাকুরের কথায় খেলেন।

এমনি করে মাকে ঠাকুর রেখেছেন চোখে চোখে। সেবা ও শুশ্রূষার অজস্রতায় যত্ন ও জিজ্ঞাসার আবেষ্টনে।

সেই চন্দ্রমণি মারা গেলেন একদিন। আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন ঠাকুর। নিঃস্বের মতো লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

এ কি সন্ন্যাসী পুত্রের ব্যবহার? সন্ন্যাসী পুত্রেরা কি মার খোঁজ রাখে, মার খবর করে, মার মৃত্যুর সংবাদ পায়, পেলেও বা কি কাঁদে মাটিতে লুটিয়ে?

ঠাকুর সন্ন্যাসীর শিরোমণি হয়ে গৃহীর মধ্যমণি। তাঁর ঘর-বন সবই সমান।

অন্তর্জলি করতে চন্দ্রমণিকে নিয়ে এলেন গঙ্গায়। যাবার আগে ফুল আর চন্দন দিয়ে মার পায়ে অঞ্জলি দিলেন ঠাকুর।

পুত্রকে শিয়রে রেখে মা চোখ বুজলেন।

মার পা দু'খানি গঙ্গা জলে ধুয়ে তাতে ঘন করে চন্দন মাখালেন ঠাকুর। এ জল চোখের জল, এ চন্দন ভক্তির চন্দন, ভালোবাসার চন্দন।

সন্ন্যাসী, তাই শ্রাদ্ধ করা নিষিদ্ধ ঠাকুরের। রামলাল শ্রাদ্ধ করলে। অশৌচ পর্যন্ত পালন করলেন না ঠাকুর। তারও বিধি নেই।

'ছেলের মতো কোনো কাজই করতে পেলুম না। কিছুতেই তৃপ্তি

দিতে পারলুম না মাকে। আমার মতো দুঃখী আর কে আছে সংসারে।'

একটু অন্তত তর্পণ করি মাকে। একটু অন্ততঃ জলাঞ্জলি দিই।

গঙ্গায় নেমে জলে হাত ডোবালেন ঠাকুর। অঙ্গুলিবদ্ধ হাত যেই তুললেন উপরে, সব জল পড়ে গেলো আঙুল গলিয়ে। শিথিল অসাড় হয়ে গেলো আঙুল, এক বিন্দু জলও ধরে রাখা গেলো না।

তেমনি ধরে রাখা গেলো না চোখের জল।

সঞ্চয় বা সংগ্রহ করা চলে না ঠাকুরের। এক বিন্দু জল পর্যন্ত নয়। কিন্তু দুই নয়নে এতো জল কি করে সঞ্চিত হলো? দুই হাতে এতো সুধাস্পর্শ? অন্তরে এতো দয়া-ক্ষমা!

নিরঞ্জন চাকরি করছে জেনে ঠাকুর বিরক্ত হলেন। পরে যখন শুনলেন মার ভরণ-পোষণের জন্যে চাকরি নিয়েছে তখন ঠাকুর সমর্থন করলেন। বললেন, 'তুই মার জন্যে চাকরি স্বীকার করেছিস, বেশ করেছিস। মা ব্রহ্মময়ী স্বরূপা।'

বিদ্যাসাগরকে বললেন, 'তুমি তো সিদ্ধ গো।'

বিদ্যাসাগর হাসলেন। বললেন, 'আমি সিদ্ধ? কই আমি তো সাধন-ভজন করি না কিছু।'

'নাই বা করলে! আলু পটল সিদ্ধ হলে কি হয়?' গভীর চোখে তাকালেন ঠাকুর: 'নরম হয়। তুমিও তেমনি নরম হয়েছো। পরের দুঃখে তোমার হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছে। তোমার ব্রত দয়া। যে পরের জন্যে কাঁদে সে তো ভগবানের জন্যেই কাঁদে।

এ কান্নাটুকুই তো ভালোবাসা। নিঃস্বার্থ পরোপকার। এই তো অহেতুক ভক্তি।

'আরেক অর্থেও তুমি সিদ্ধ। তুমি মাতৃভক্ত। আর তোমার মার নামও ভগবতী সর্বসিদ্ধিপ্রদা ভুবনেশ্বরী।'

'আর সব ডাক ফুরোয়। মা ডাক ফুরোয় না।'

এই 'মা'-ই ঠাকুরের একমাত্র মন্ত্র। একাক্ষর মন্ত্র।



বালকস্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণ

ঘাসবনে কি কামড়েছে রামকৃষ্ণকে ।

সাপ বোধহয় !

কি হবে !

কে একজন বলেছিলো রামকৃষ্ণকে, দ্বিতীয়বার যদি কামড়ায় তবে বিষ ঠিক তুলে নেয় সাপ । এখন সেই সাপ পাই কোথায় !

সেই সাপ না হোক, আরেকটা হলেই তো চলে । সাপের গর্ত খুঁজতে লাগলেন রামকৃষ্ণ । এ গর্ত না ও গর্ত ।

'কি করছেন ?' কৌতুহলী হয়ে কে একজন জিগ্যেস করলো ।

'সাপ খুঁজছি ।'

'সে কি কথা !'

তখন তাকে সব কথা বললেন রামকৃষ্ণ । দ্বিতীয় দংশনে বিষে বিষক্ষয় দরকার । নইলে এ যাত্রাই শেষ যাত্রা ।

সব শুনে লোকটি চিন্তিত হবার ভান করলো। বললো, 'শুধু আরেকবার কামড়ালেই তো চলবে না। ঠিক প্রথম জায়গাটিতেই কামড়ানো চাই।'

সত্যি? এ তো বড়ো ঝামেলার কথা। দ্বিতীয় সাপ প্রথম দংশনের জায়গা যদি ঠিক না ঠাহর করতে পারে।

উঠে পড়লেন রামকৃষ্ণ। দরকার নেই সাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

কৈ, কিছু হলো না তো! বিছে-টিছে কামড়েছিলো হয়তো।

'শরতের হিম খুব ভালো।' একদিন বললো এসে রামলাল।

'ভালো?'

'হ্যাঁ, মাথা ঠাণ্ডা থাকে।' সংস্কৃত একটা শ্লোক ছাড়লে রামলাল।

হবেও বা! শ্লোকের আমি কি জানি! যখন বলছে, তখন গুরু-গম্ভীর হয়ে, বিশ্বাস না করে উপায় কি!

কলকাতা থেকে ঘোড়ার গাড়িতে করে ফিরছেন দক্ষিণেশ্বর। আশ্বিন মাসের রাত। হাওয়াতে ঠাণ্ডার একটু আমেজ লেগেছে। মনে পড়ে গেলো, যাতে হিমটুকু বেশ লাগে, তাই গাড়ি থেকে মাথা বাড়িয়ে দিলেন রামকৃষ্ণ।

তারপরেই পড়লেন অসুখে।

বালকস্বভাব রামকৃষ্ণ। সরল, অলজ্জ, নিরাসক্ত।

লজ্জা ঘৃণা ভয়—তিন থাকতে নয়। একমাত্র বালকেরই লজ্জা নেই, ঘৃণা নেই, ভয় নেই। একমাত্র বালকই অবন্ধন।

ঈশ্বরও বালকস্বভাব।

যেমন কোনো ছেলে কোঁচড়ে রত্ন নিয়ে বসে আছে। বসে আছে রাস্তার ধারে। যে রাস্তা দিয়ে দিন-রাত্রি হেঁটে চলেছে যাত্রীদল। আমায় দাও না, আমায় দাও না, বলে রত্নের জন্য কতো লোক সাধাসাধি করছে। কিন্তু রত্নের মালিক সেই ছেলে কাপড়ে হাত

চেপে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলছে, না—দেবো না, কখনো না। কিন্তু এমন কেউ হয়তো চলে যাচ্ছে সুমুখ দিয়ে, রত্নের জন্য একবিন্দু যার প্রার্থনা নেই, চলে যাচ্ছে উপেক্ষা করে, তারই পিছে পিছে ছুটে যাচ্ছে সেই রত্নেশ্বর। বলছে, সকাতরে বলছে, ওগো, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও এই স্পর্শমণি। তোমাকে আমি অমনি দিয়ে দিচ্ছি।

এমনি ঈশ্বরের কৃপা। ঠিক বালকের যেমন খামখেয়াল।

কার উপর কখন তাঁর কৃপা হবে কেউ বলতে পারে না।

হনুমানকে দড়ি-দড়া দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে লবকুশ। মাকে গিয়ে বলছে, 'মা, মহাবীরকে বন্দী করেছি।'

'মহাবীরকে ?' সীতা তো অবাক।

'হ্যাঁ মা, এই যে বেঁধে এনেছি তোমার সামনে।'

মহাকায় হনুমান তখন ছোট্টটি হয়ে গিয়েছে। কুঁকড়ে-সুকড়ে এতোটুকু ! কে বলবে এই সেই সমুদ্র-লাফানো গন্ধমাদন-বয়ে-আনা বীর-বলী হনুমান !

তুই ভাইয়ের মহাফুর্তি। অসাধ্য সাধন করেছি। ধরে-বেঁধে টেনে এনেছি ঘরের তুয়ারে। তখন হনুমান বললো হাসিমুখে :

'ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব,
ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে ?'

রাম তনয়দের কাছে হনুমান ইচ্ছে করেই ধরা দিয়েছে। নইলে সাধ্য কি বাঁধে তারা পবন তনয়কে !

তেমনি, ভগবান যদি কৃপা করে ধরা দেন তবেই তাঁকে ধরা সম্ভব। নচেৎ কিছুতে নয়, কিছুতে নয়। কিন্তু কেমন করে তাঁর কৃপা পাবে ?

বালকের মতো সরল হও, অকপট হও ; সেয়ানা বুদ্ধি ছাড়ো।

ছেলেকে মা বলছেন, 'ও তোর দাদা।'

ছেলের অমনি বিশ্বাস যে, ও আমার দাদা। তা সে হয়তো বামুনের ছেলে, আর দাদা হয়তো ছুতোর কি কামার।

মা বলেছেন, 'ও-ঘরে জুজু আছে।'

ষোলোআনা বিশ্বাস—ও-ঘরে জুজুর আস্তানা।

জটিল বালকের গল্প বললেন রামকৃষ্ণ : 'জটিল বালক বনের পথ দিয়ে পাঠশালায় যেতে বড়ো ভয় পায়। মাকে বলতে মা বললেন, ভয় কি, মধুসূদনকে ডাকবি।

'কে মধুসূদন ?' জিগ্যেস করলো জটিল।

'মা বললেন, তোর দাদা।

'পরদিন নির্জন পথ দিয়ে যেতে যেতে যেমনি ভয় পেলো অমনি মার কথা মনে পড়লো : দাদা মধুসূদন, দাদা মধুসূদন, বলে ডাকতে লাগলো জটিল। কারো সাড়া-শব্দ নেই, সব নিশ্চুপ। তখন গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগলো জটিল : কোথায় দাদা মধুসূদন, দেখা দাও, আমার হাত ধরো, আমার যে ভয় পেয়েছে!

'মধুসূদন আর থাকতে পারলেন না লুকিয়ে। কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, এই যে আমি, ভয় কি ? হাত ধরে পাঠশালার রাস্তায় পৌঁছিয়ে দিলেন জটিলকে।'

আরো একটি গল্প বললেন রামকৃষ্ণ : 'এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে ঠাকুর-সেবা ছিলো। সেদিন ব্রাহ্মণের আর কোথাও কাজ পড়েছে। ছোটো ছেলেটিকে বললো, তুই আজ ঠাকুরের ভোগ দিস, বুঝলি ? ফিরতে আমার রাত হবে।

'কি করতে হবে জানতে চাইলো ছেলে। বাপ বললো, আর কিছু নয়, খাওয়াবি শুধু ঠাকুরকে। ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া মানে ঠাকুরকে খাওয়ানো।

'বাপ চলে গেলো। পূজোর ঘরে গিয়ে ঠাকুরকে ভোগ দিলো ছেলে। কিন্তু ও কি, ঠাকুর যে চুপ করে বসে আছেন! কথাও কন না, খানও না। অনেকক্ষণ বসে বসে দেখলো ছেলে, কিন্তু ঠাকুরের আর গা তোলবার নাম নেই। তখন সে বারবার বলতে লাগলো,

ঠাকুর খাও, অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে, আমি আর বসতে পাচ্ছি না।

'ঠাকুর তবুও অনড়, অচল। তখন ছেলেটি কান্না শুরু করলো। বলতে লাগলো, ঠাকুর, বাবা তোমাকে খাওয়াতে বলে গেছেন, তুমি কেন আমার কাছে খাবে না? বাবা এলে তবে কি বলবো?

'ব্যাকুল হয়ে যেই অনেকক্ষণ কেঁদেছে, ঠাকুর অমনি হাসতে হাসতে আসনে এসে বসে খেতে লাগলেন। ঠাকুরকে খাইয়ে সবে ঘর থেকে যখন ছেলেটি বেরিয়ে এলো, বাড়ির লোকেরা বললো, ভোগ হয়ে গেছে? এখন সে সব নামিয়ে আন্।

'ছেলেটি বললে, নামিয়ে আনবো কি, ঠাকুর সব খেয়েছেন।

'বাড়ির লোকেরা বললো, সে কি রে? কি বলছিস তুই!

'সরল, তরল চোখ তুলে ছেলেটি বললো, কেন, ডাকলুম, কাঁদলুম, ঠাকুর তো এসে খেয়ে গেলেন!

'তখন ঠাকুর-ঘরে গিয়ে দেখে সকলে অবাক।'

ছোটো ছোটো ছেলের সঙ্গে খেলা করেন রামকৃষ্ণ। ছোটো ছেলেদের কাছাকাছিই ভগবানের বাসা। ধুলো-বালিমাখা ছন্নছাড়া শিশু-ভোলানাথ। যতোক্ষণ শিশুর সঙ্গে আছো—ততোক্ষণই আছো ঈশ্বরের প্রতিবেশী হয়ে। শিশুই হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতীক। ঈশ্বরের প্রতিভূ। শিশুর প্রধান গুণটিই হচ্ছে সরলতা। পেটে মুখে এক হওয়া! আর সরল হলেই ঈশ্বর-লাভ!

'ছোকরাদের অতো ভালোবাসি কেন?' বললেন রামকৃষ্ণ: 'ওরা যে খাঁটি দুধ—একটু ফুটিয়ে নিলেই হয়—ঠাকুর সেবায় চলে। জোলো দুধ অনেক জ্বাল দিতে হয়, অনেক কাঠ পুড়ে যায়। ঈশ্বর বিষয়বুদ্ধি থেকে অনেক দূর। তা না হলে একেবারে হাতের ভেতর।'

যদি ঈশ্বরের কৃপা পেতে চাও, সরল হয়ে যাও। অন্তরে যতোক্ষণ গরল আছে ততোক্ষণ সরল হওয়া যায় না। অন্তরের গরল ধুয়ে ফেলতে হলে চাই শুধু তরল অশ্রুজল। আর সরলতার সঙ্গে চাই একটু ব্যাকুলতা।

হৃদয়রামের ছেলের চার-পাঁচ বছর মোটে বয়স। সারাদিন থাকে রামকৃষ্ণের সঙ্গে। খেলা করে। কিন্তু যেই সন্ধ্যা হয়, অমনি কেঁদে ওঠে। মা যাবো! কতো তাকে ভোলাবার চেষ্টা করেন রামকৃষ্ণ, কিছুতেই শোনে না। পয়সা দেবো, খাবার দেবো, কোনো কিছুতেই রুচি নেই। খেলা-টেলা সব তেতো লাগে। শুধু অবিরাম কান্না, মা যাবো!

তখন তার অবস্থা দেখে রামকৃষ্ণ কাঁদতে বসেন। তাঁরও মুখে সেই কথা ঃ মা যাবো।

চাই এই বালকের ব্যাকুলতা। এই বালকের মতো ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে হবে ঈশ্বরের জন্য।

মেঝেতে বসে আছেন রামকৃষ্ণ। এক ভক্ত এক চ্যাঙাড়ি জিলিপি নিয়ে এসেছে তাঁর জন্য। জিলিপি দেখে তো রামকৃষ্ণ ভারী খুশি ঃ 'দেখছো, আমি মায়ের নাম করি বলে এ-সব জিনিস খেতে পাচ্ছি—'

একটি ছ-সাত বছরের ছেলে এসে ঘরে ঢুকলো। রামকৃষ্ণের তখন বালকের অবস্থা। এক ছেলে যেমন আরেক ছেলের কাছ থেকে খাবার লুকিয়ে রাখে—ঠাকুরেরও এখন সেই ভাব। জিলিপির চ্যাঙাড়ি হাত ঢেকে লুকোবার চেষ্টা করছেন। তাই নয়, একেবারে সরিয়ে ফেললেন। পাছে আরেক বালকের চোখে পড়ে। পাছে সে ভাগ বসায়।

এই বালক-ভাবে থাকতে থাকতে, হাত দিয়ে জিলিপি ঢাকতে ঢাকতে সমাধিস্থ হলেন রামকৃষ্ণ।

'মা, পরমহংস তো বালক। বালকের মা চাই না? তাই তুমি মা, আমি ছেলে। মার ছেলে মাকে ছেড়ে কেমন করে থাকে?'

বালকের সব নির্ভর যেমন মার ওপর, রামকৃষ্ণেরও তেমনি সমস্ত সমর্পণ ঈশ্বরে।

দাসীর যে ছেলে, সেও বাবুর ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে বলে, মাকে বলে দেবো।

ছোটো ছেলে মা ছাড়া আর কিছুই জানে না। রামকৃষ্ণও তেমনি। রঙিন চুষি-কাঠি ফেলে দিয়ে ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদছে মার জন্য। বালিশ চাপা দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে গিয়েছিলো মা। বালিশ ছুঁড়ে ফেলে শুরু করেছে চেঁচাতে। সাধ্যি কি—মা থাকবে কর্মান্তরে? ছুটে এসে কোলে নেবে। মার ঐ উত্তপ্ত উৎসঙ্গকুটুই সমস্ত জীবনের উপশম।

মাকে পাবার জন্যই ঐ বালক-ভাব।

চিৎ হয়ে শুয়ে শিশুর মতো নিজের পায়ের বুড়ো আঙুল চুষছেন রামকৃষ্ণ। হাসছেন নির্গলিত শুভ্রতায়। কখনো বা বাৎসল্যে বিভোর হয়ে বালিশকে সন্তান ভেবে দুধ খাওয়াচ্ছেন। কখনো বা কাপড় বগলে করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন উদাসীনের মতো।

বালকই তো সন্ন্যাসী। বালকই তো ঈশ্বর। এই খেলা ঘর তৈরী করছে, এই আবার ভেঙে দিচ্ছে অবলীলায়। এই ঝগড়া করছে, পরের মুহূর্তেই আবার গলায় গলায় ভাব।

অহঙ্কার খারাপ। কিন্তু 'আমি বালক' এই আমিত্বটুকুই মধুর।

'হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়। মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়।' বললেন রামকৃষ্ণ: 'তেমনি, আমি বালক, আমি সন্তান, এটুকু অহঙ্কারের মধ্যে নয়। এ আমিত্বে বরং উপকার আছে। যেমন হিঞ্চে শাকে পেট ঠাণ্ডা হয়। মিছরিতে অম্ল যায়। অন্য শাকে, অন্য মিষ্টিতে অসুখ করে।

কিন্তু এ বালক-ভাবটি আনি কি করে?

দিনে রাতে যখন যতো পারো মেশো এই বালকদের সঙ্গে। মিশতে মিশতেই রসিয়ে উঠবে। ভিতরে রস না এলে বাইরে কি রং ধরে?

ভক্তেরা ফুল দিয়ে গিয়েছে রামকৃষ্ণকে। বালকের মতো ফুল নিয়ে খেলা করছেন রামকৃষ্ণ। কখনো ফুল নিজের মাথায় দিচ্ছেন, কখনো গলায়, কখনো বুকে, কখনো নাভিতে। বলছেন, 'এখন আমার বালক-স্বভাব। তাই ফুল নিয়ে এরকম করছি। কি দেখছি জানো? শরীরটা যেন বাঁকারি-সাজানো কাপড় মোড়া, সেইটে নড়ছে। ভেতরে একজন আছে বলেই নড়ছে। তাই নয়?'

শিবুর সঙ্গে ভাব খুব, শিবু রামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ। বয়স চার-পাঁচ বছর।

মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বিদ্যুৎ দেখে শিবুর খুব আনন্দ। চোখ বড়ো বড়ো করে বলছে রামকৃষ্ণকে, 'খুড়ো, ঐ চকমকি ছাড়ছে।'

যেমনটি শুনেছে তেমনিটি বিশ্বাস করেছে। অন্য কথা বলো, কিছুতেই স্বীকার করবে না। যেমন গ্রামোফোন শুনে বললো, খোলের মধ্যে বসে গান গাইছে কেউ।

ফড়িং ধরতে যাচ্ছে শিবু। অন্যমনে, প্রায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে। পাতা নড়ছে গাছে। তাই দেখে ভারী বিরক্ত। বলছে পাতাকে, চুপ চুপ, নড়িসনে, আমি ফড়িং ধরবো।

সব চৈতন্যময় দেখছে বালক। চাই সেই বালকের দৃষ্টি।

বাপের সঙ্গে নেমন্তন্নে যাচ্ছে ছোটো ছেলে। কতোদূর গিয়ে ছেলে বলছে, বাবা আমার প্যান্টের বোতাম নেই। বাবা বললেন, তোর বোতাম লাগ্‌বে না। বাপের কথা অকাতরে মেনে নেয় ছেলে। বাবা যখন বলছেন তখন আর ভাবনা কি।

তেমনিধারা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন রামকৃষ্ণ। পরনে ধুতি, পায়ে চটি, গায়ে ফতুয়া। সঙ্গে মহেন্দ্র গুপ্ত—মাষ্টারমশাই। গেট দিয়ে ঢুকবেন, বলে উঠলেন রামকৃষ্ণ, 'ওহে মাষ্টার, ফতুয়াতে বোতাম নেই যে।'

মাষ্টারমশাই বললেন, 'আপনার বোতাম লাগে না।'

'লাগে না নাকি?'

'না'—অভয় দিলেন মাষ্টারমশাই।

তাই মেনে নিলেন রামকৃষ্ণ। মাষ্টারমশাই জ্ঞানী-গুণী লোক। তিনি যখন বলছেন তখন আর সন্দেহ কি।

থিয়েটারে পার্ট নিয়েছে বাপ, সেনাপতির। মার কোলে বসে প্লে দেখছে ছেলে। সেনাপতিকে সেনাপতি বলে ভাবতে পারছে না, বাপ বলেই দেখছে। থিয়েটারে শত্রুপক্ষের লোক সেনাপতিকে তলোয়ারের ঘা মারলো। তাই দেখে ছেলের নিদারুণ কান্না। আমার বাবাকে মারলে,

বাবাকে মারলে! মা তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারছে না, ওটা অভিনয়, ওটা ছলনা, যাকে মেরেছে সে নাটকের সেনাপতি, বাস্তবের পিতা নয়। কিন্তু কিছুতেই বুঝ মানছে না ছেলে।

তেমনিধারা ষ্টার থিয়েটারে 'দক্ষ-যজ্ঞ' প্লে দেখছেন রামকৃষ্ণ।

গিরীশ ঘোষ দক্ষের পার্ট নিয়েছেন। ষ্টেজে নেমে বলছেন ক্রুদ্ধ হুঙ্কার দিয়ে: 'শিবনাম ঘুচাইব ধরাতল হতে।'

উপরে, বক্সে আছেন রামকৃষ্ণ। গিরীশের হুঙ্কার শুনে তিনি তো স্তম্ভিত। তিনি গিরিশকে দক্ষরূপে দেখতে পাচ্ছেন না, গিরীশরূপেই দেখছেন। গিরীশের দম্ভোক্তি শুনে তিনি হতবাক্। আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন: 'শিবনাম ঘোচাবি কি রে!' বলতে বলতে নেমে এলেন নীচেয় ষ্টেজের ধারে। গিরীশকে লক্ষ্য করে ভৎর্সনা করে উঠলেন: 'তোকে এতোদিনে তবে শেখালাম কি! তুই শিবনাম ঘোচাবি?'

গিরীশ করজোড়ে বললেন, 'প্রভু, এ-কথা তো আমি বলছি না, দক্ষ বলছে।'

'তুই বলছিস না!' কিঞ্চিৎ যেন আশ্বস্ত হলেন রামকৃষ্ণ।

'না। ও দক্ষের কথা। আর দক্ষও শেষকালে ধরবে শিবনাম।'

'ধরবি তো? দেখিস! ভুলিসনে।'

বালকস্বভাব রামকৃষ্ণ। অষ্টপাশ আর তিন গুণের বাইরে।

ছোটো ছেলে শুধু তার মাকে ডাকে। রামকৃষ্ণেরও তাই। ঈশ্বরকে ডাকাই তাঁর পূজা। শুধু ঈশ্বরের নাম করাই তাঁর সাধন-ভজন।

এবার বালগোপাল হয়েছেন রামকৃষ্ণ।

কামারহাটীর অঘোরমণি, বাষট্টি বছরের বুড়ি। গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে। বিশ্বের যিনি অধীশ্বর তাকে ছোট্ট শিশুরূপে, সন্তান-রূপে বুকের মধ্যে আকর্ষণ করেছে। মাতৃস্নেহাতুর নিষ্কিঞ্চন শিশু।

রাত তিনটের সময় জপে বসে অঘোরমণি।

সেদিন জপে বসেছে, হঠাৎ কে এসে বসলো তার পাশটিতে। গা কাঁটা দিয়ে উঠলো! কে, কে তুমি? চমকে চোখ চেয়ে দেখলো—এ কি, এ যে সেই দক্ষিণেশ্বরের সাধু! রামকৃষ্ণ! মুখে সেই আনন্দ ভরা শিশুর হাসি, এতো রাতে এখানে কি করে?

পাছে আবার চলে যান, সহসা নিজের হাত বাড়িয়ে ধরলো রামকৃষ্ণের বাঁ হাত। অঘটন ঘটে গেলো তক্ষুণি। প্রৌঢ় রামকৃষ্ণ চকিতে একটি দশমাসের শিশু হয়ে গেলো। শিশু হয়েই হামা দিয়ে একেবারে অঘোরমণির বুকের কাছে চলে এলো। হাত তুলে মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'মা গো, ননী দে।'

অঘোরমণি দিশাহারা হয়ে গেলো। কেঁদে উঠলো অঝোরে। বললো, 'বাবা, আমি কাঙালিনী। চির দুঃখিনী। ননী কোথা পাবো? আমি খুদ খাই, পাতা কুড়োই। আজ আনি তো কাল খাই। ক্ষীর-সর-ননী আমি কোথায় পাবো, বাবা!'

ওসব শোনবার মতো ছেলে নয় গোপাল। অঘোরমণির হাত থেকে জপের মালা কেড়ে নিলো, আঁচল টানতে লাগলো সজোরে। বায়না ধরা অবুঝ ছেলের মতো বললো, 'ওসব আমি জানি না। খেতে দিতে না পারিস তো মা হয়েছিস কেন, খেতে দিতে হবে। মা হয়ে সন্তানকে তুই অনাহারী রাখবি?'

তখন কি করে, শিকে থেকে নারকেল নাড়ু পেড়ে আনলো অঘোর-মণি। গোপালের ছোটো হাতখানি ভরে দিলো। বললো, 'বাবা গোপাল, এ বাসি নাড়ু। তোমাকে দিতে বুক ফেটে যাচ্ছে।'

কিসের বাসি নাড়ু। তৃপ্তি করে তাই খেতে লাগলো গোপাল। গোপালবেশী রামকৃষ্ণ।

সকাল হতেই অঘোরমণি ছুটলো দক্ষিণেশ্বরে।

গোপাল! গোপাল! মুখে শুধু এই স্নেহার্দ্র আকুলতা।

ঘরে ঢুকে পড়লো, কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, বসলো রামকৃষ্ণের পাশ ঘেঁষে। মুখে শুধু সেই বিগলিত কান্না: গোপাল! গোপাল!

ভাবাবেশে রামকৃষ্ণ অঘোরমণির কোলে চড়ে বসলেন। বাষট্টি বছরের বুড়ির কোলে আটচল্লিশ বছরের প্রৌঢ়।

আসলে যশোদার কোলে গোপাল।

ঈশ্বর সন্তানরূপে অবতীর্ণ। শিশুরূপে অবতীর্ণ।

হে ঈশ্বর, শিশুর মতো সরল করো, সহজ করো, স্বচ্ছ করো। নির্মল করো, নিরাময় করো। তোমার খেলার সঙ্গী করে নাও। রিক্ত করো, যাতে মুক্তির আনন্দে খেলতে পারি তোমার সঙ্গে।

ছোটো ছেলেটি হলেই তো তুমি আমাকে ধরবে। আমার ভার নেবে। আর তুমি যদি আমাকে ধরো, আমার ভার নাও, তবে আর আমার ভাবনা কি! আমাকে তখন পায় কে?





'তুমি ঈশ্বর দেখতে চাও? আমি তোমাকে এখনি দেখিয়ে দিতে পারি।' বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ: 'গুণদর্শনই ঈশ্বরদর্শন।'

শুধু গুণ দেখো। যে পরিমাণে গুণ বিকশিত, সেই পরিমাণে ঈশ্বর প্রকাশিত। জল কোথাও ধানের শিষে শিশির বিন্দু, কোথাও গেড়ে-ডোবা, কোথাও সরোবর-দীঘি, কোথাও হ্রদ, কোথাও নদী, কোথাও

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর



সমুদ্র। জল দেখো। কোনোখানে প্রদীপ, কোনোখানে মশাল, কোনোখানে বা আবার দাবানল। আগুন দেখো।

যেখানেই গুণ দেখেন, সেখানেই মাথা নোয়ান ঠাকুর। সে বীণকার মহেশ সরকারই হোক বা বিদ্যার সাগর বিদ্যাসাগরই হোক।

কাশীতে এসেছেন। মথুরবাবুকে বললেন, 'মহেশের বীণা শুনবো।'

কোনো একটা এঁদো বিশ্রী গলিতে মহেশের বাসা। সেখানে মথুরবাবুর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ গেলে মথুরবাবুর ·ান থাকে না। তাই মথুরবাবু বললেন, 'বেশ তো, খবর পাঠাই মহেশকে, আমার বৈঠকখানায়ই সে আসর জমাক।'

মথুরবাবুর নিমন্ত্রণ পেলে মহেশ কৃতার্থ হয়ে যাবে।

কিন্তু ঠাকুর থ বনে গেলেন। বললেন, 'সে কী কথা? মহেশ কেন আসতে যাবে? আমি যাবো তার বাড়ি। তার বাড়ি তো এখন তীর্থ, সেখানে স্বয়ং সরস্বতীর আবির্ভাব। আমি সেখানে গিয়ে আমার প্রণাম রেখে আসবো। সেখানে তার বাজনাই তো শুনবো না, দেখবো বীণাপাণিকে। সে আসবে না। আমি যাবো। আমিই পিপাসু। আমিই তীর্থঙ্কর।'

তাই সেদিন বললেন মাষ্টারমশাইকে, 'আমার বিদ্যাসাগরকে দেখতে বড়ো সাধ হয়। একদিন নিয়ে যাবে তার কাছে?'

কতো গুণ! কতো দয়া!

একটা ঝাঁকামুটে কলেরা হয়ে পড়ে আছে রাস্তায়, তাকে কোলে করে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছে চিকিৎসার জন্য! বাছুরেরা মায়ের দুধ পায় না দেখে বন্ধ করেছে দুধ খাওয়া। ঘোড়ার কষ্ট দেখে চড়ে না আর ঘোড়ার গাড়ি। •মায়ের ইচ্ছা-পূরণ করতে সাঁতরে পার হলো দামোদর। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতের অনৈক্য হতেই এক কথায় ছেড়ে দিলো চাকরি, কলেজের প্রধান অধ্যক্ষের কাজ। আর কতোবড়ো পণ্ডিত, বিদ্যায় কি অগাধ অনুরাগ!

বিদ্যাই তো সব! বিদ্যা থেকেই ভক্তি, দয়া, শ্রদ্ধা, প্রেম। বিদ্যা

থেকেই বিনয়, অনহঙ্কার, শরণাগতি। বিদ্যাই ঈশ্বর মন্দিরে শেষ তোরণ।

বিদ্যাসাগরের কাছে এলেন মাষ্টারমশাই। বললেন, 'দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতে চান।'

'পরমহংস?' বিদ্যাসাগর অবাক মানলেন। 'কেমনতরো পরমহংস? গেরুয়া-টেরুয়া পরে নাকি?'

মাষ্টারমশাই বললেন, 'আজ্ঞে না। সে এক আশ্চর্য পুরুষ। সন্ন্যাসী হয়েও সংসারী, আবার সংসারী হয়েও সন্ন্যাসীর শিরোমণি। লালপেড়ে কাপড় পরেন, গায়ে জামা রাখেন, পায়ে বার্নিস করা চটি জুতো। গাছতলায় ধুলোমাটিতে পড়ে থাকেন না, রাসমণির কালী-বাড়িতে একটি ঘরের মধ্যে বাস করেন, তক্তাপোশে বিছানা পেতে দিব্যি মশারী খাটিয়ে শোন্—'

'তাহলে বৈশিষ্ট্য কি?'

'একেবারে বালকের মতো। ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না, সর্বক্ষণ মা নামে মাতোয়ারা।'

'নিয়ে এসো একদিন।'

খালের পোল পেরিয়ে শ্যামবাজার হয়ে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে পড়েছে ঘোড়ার গাড়ি। এবার পড়বে বাদুড়বাগান। এর পরেই বিদ্যার সমুদ্র।

ভাবাবেশ হলো ঠাকুরের। এখন আর অন্যকথা বলো না, শুধু বিদ্যার কথা বলো। যে জ্ঞান ঈশ্বরের দিকে টেনে নিয়ে যায়, অক্ষয় পুরুষকে জানতে শেখায়, সেই বিদ্যা।

ফটক পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকছেন, হঠাৎ বলে উঠলেন, 'জামার বোতাম খোলা রয়েছে, এতে কোনো দোষ হবে না?'

'না, দোষ হবে না।' বললেন মাষ্টারমশাই, 'আপনার কিছুতে দোষ নেই। আপনার দরকার নেই বোতামে।'

'নেই!' নিশ্চিন্ত হলেন ঠাকুর।

এই বিদ্যাসাগর। পরনে থান কাপড়, পায়ে চটি জুতো, গায়ে হাতকাটা ফ্লানেলের জামা। প্রসন্ন প্রশস্ত মুখ, উন্নত ললাট, শুভ্র দাঁত। খর্বদেহ সংহত তেজঃপুঞ্জ।

বিদ্যাসাগরকে দেখেই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'তুমি তো সিদ্ধ গো।'

'আমি সিদ্ধ?' থমকে গেলেন বিদ্যাসাগর। 'কৈ, আমি তো সাধন-ভজন করি না, মঠে-মন্দিরে যাই না, ঘুরি না তীর্থে ঘাটে, আমি —আমি সিদ্ধ হলাম কি করে?'

ঠাকুর বললেন, 'সিদ্ধ হতে হলে সাধন-ভজন করতে হয় না, যেতে হয় না মঠে মন্দিরে।'

'তবে?'

'সিদ্ধ হলে কি হয়? আলু-পটল যখন সিদ্ধ হয় তখন কি হয়?' সহাস্য বয়ানে জিগ্যেস করলেন ঠাকুর, 'বলো কি হয়? নরম হয়। তোমার হৃদয়ও পর-দুঃখে দ্রবীভূত হয়েছে। তুমি নরম হয়েছো। সুতরাং তুমি সিদ্ধ।'

পরও যা পরমও তাই। তুমি পরের দুঃখে কাঁদছো, তার মানে তুমি ঈশ্বরের দুঃখে কাঁদছো। নইলে যে সত্যি পর তার মধ্যে তুমি তোমার আপনজনকে দেখছো কি করে? যে আর্ত সেই তোমার পরমাত্মীয়, তোমার ঈশ্বর। পরোপকারই ঈশ্বর সাধনা।

'কিন্তু জানেন', বললেন বিদ্যাসাগর, 'কলাই বাটা সিদ্ধ হলে শক্ত হয়ে যায়।'

ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'তুমি কি বাটা ডাল? তুমি আস্ত ডাল। তুমি একটা গোটা মানুষ। যারা শুধু পণ্ডিত তারাই দরকচা-পড়া। যেমন খুব উঁচুতে উঠেও শকুনের ভাগাড়ের দিকে নজর তেমনি শুধু-পণ্ডিতগুলো উঁচুতে উঠেও বিষয়েই আবদ্ধ। কিন্তু তুমি তো শুকনো ডাঙা নও, তুমি সাগর। শুষ্ক পণ্ডিত নও, তুমি বিদ্যার অম্বুনিধি। বিদ্যা থেকেই দয়া, বিদ্যা থেকেই ভক্তি, বিদ্যা থেকেই বৈরাগ্য।'

একঘর লোক শুনছে মুগ্ধ হয়ে।

'তাই', বললেন ঠাকুর, 'আজ বড়ো আনন্দের দিন। আজ সাগরে এসে মিললাম। এতোদিন শুধু খাল-বিল, নদ-নদীই দেখেছি, আজ আমার সমুদ্র দর্শন।'

'সাগরে যখন এসে মিললেন', বললেন বিদ্যাসাগর, 'তখন কিছু লোনা জল নিয়ে যান।'

'লোনা জল কেন? তুমি ক্ষীর-সমুদ্র।'

আর তুমি? তুমি অমৃতের পারাবার। গুণী না হলে কি গুণ দেখে? ভালো না হলে কি ভালো বলে?

'তোমার মধ্যে দেখছি আমি ঈশ্বরের শ্রী, সমস্ত রূপিণী বিদ্যামূর্তি।'

আসলে মানুষের শুধু দুটো দুঃখ। এক দুঃখের নাম অহঙ্কার, আরেক দুঃখের নাম পরশ্রীকাতরতা।

ঠাকুর বললেন, 'অহঙ্কার যখনই মনে এই জিজ্ঞাসা আনবে তখনই জাগবে দীনতা। অহঙ্কারের উৎখাত হবে।'

যদু মল্লিক বললো, 'তুমি হরি-হরি করতে পারো, আমি কেন টাকা-টাকা করতে পারবো না? টাকার মধ্যে কি ঈশ্বর নেই?'

ঠাকুর বললেন, 'বল্ ঈশ্বরের টাকা তোর টাকা নয়। তোকে অবলম্বন করে ঈশ্বর বিত্তরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। তাই এ তোর কৃতিত্ব নয়, এ ঈশ্বরের কৃপা। যখন নিজের সাফল্যে ঔজ্জ্বল্যে তাঁর কৃপা দেখবি, তখন আর কিসের অহঙ্কার?'

তেমনি পরশ্রী মানে পরমের শ্রী। পরমের শ্রীকে দেখে কি কেউ কাতর হয়? এক আকাশ তারা বা এক মাঠ ফুল কি মানুষকে দুঃখিত করে? কখনো না—উল্লসিত করে। গহন পার্বত্য অরণ্যে একটি কলস্বরা নির্ঝরিণী, আবিষ্কার করলে মানুষ করতালি দিয়ে ওঠে। ভোরে-জাগা এক গাছ পাখির কাকলি শুনে কূল-ভাঙা গান জাগে হৃদয়ে। কোথাও তিনি বিত্তের শ্রী, বিদ্যার শ্রী, শক্তির শ্রী, দীপ্তির শ্রী হয়ে বিরাজ করছেন। তাই পরশ্রীতে কাতর না হয়ে আনন্দিত হও। পরশ্রী-কাতর নয় পরশ্রী-আনন্দিত।

'তাই যদু মল্লিকের মধ্যে আমি টাকা দেখি না, বৈভবরূপী বিভুকে দেখি। শ্রী দর্শনই ব্রহ্মদর্শন।'

'কী ব্রহ্ম ?' জিগ্যেস করলেন বিদ্যাসাগর।

'এটিই মজা।' বললেন ঠাকুর, 'আর সব বস্তু মুখে আনা যায় কিন্তু ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট।'

'আর সব বস্তু মুখে বর্ণনা করা যায় কিন্তু ব্রহ্ম অবর্ণনীয়। কোনো রসনার সাধ্য নেই তার স্বাদের ব্যাখ্যা করে। তার সংজ্ঞা দেয় বা তার রূপরীতি জানায়-বোঝায়। সব তন্ত্র-মন্ত্র, শাস্ত্র-দর্শন এঁটো হয়ে গিয়েছে, তার মানে মুখে পড়া হয়েছে, বলা হয়েছে, নির্ণয়-নিরূপণ হয়েছে। কিন্তু ব্রহ্ম অনুচ্চারিত, অকথিত, অনিরূপিত। ব্রহ্ম অনুচ্ছিষ্ট।'

যে বোঝবার নয় তাকে বোঝানো। যাকে রসনায় আনবার নয় তাকে বসানো হলো হৃদয়ে।

'কিছু খাবার দিলে কি ইনি খাবেন ?' অনুচ্চ স্বরে মাষ্টারমশাইকে জিগ্যেস করলেন বিদ্যাসাগর।

শুনতে পেয়েছেন ঠাকুর। সরল খুশিতে বলে উঠলেন: 'দাও না।'

ব্যস্ত হয়ে বিদ্যাসাগর অন্তঃপুরে ঢুকলেন। নিয়ে এলেন একথালা মিষ্টি। বললেন, 'এ খাবার বর্ধমান থেকে এসেছে।'

'যেখান থেকেই আসুক, মধুর সব সময়েই মধুর।' ঠাকুর হাত বাড়িয়ে নিলেন সেই থালা।

বিদ্যাসাগর বললেন, 'তাহলে আপনি বলছেন ঈশ্বর কাউকে বেশী শক্তি কাউকে কম শক্তি দিয়েছেন ?'

'নিশ্চয়ই।' খেতে খেতে বলছেন ঠাকুর: 'তাঁর যেখানে যেমন খুশি। পিঁপড়েতেও শক্তি আবার হাতিতেও শক্তি। একজন পালিয়ে যায়, আরেকজন হারিয়ে দেয়। নইলে তোমার কাছে আসি কেন ? অন্যের তুলনায় তোমার দয়া বেশী, বিদ্যা বেশী, হৃদয় বেশী—তাই। নইলে তোমার তো আর শিং বেরোয়নি বা লেজ গজায়নি। আকাশের দিকে তাকাই কেন ? না, সেই তো বৃহতের শেষ সীমা।'

ঠাকুর থামলেন। একটু হেসে বললেন, 'এ-সব যা বলছি, কিছুই অজানা নয়। তবে কি জানো? তোমার খবর নেই। বরুণের ভাণ্ডারে কতো কি রত্ন আছে তা বরুণ রাজাই জানে না।

'অনেক বাবু আছেন যাঁরা বাড়ির চাকর-বাকরেরই নাম জানেন না, বলতে পারেন না বাড়িতে কোথায় কি জিনিস আছে। আজে বাজে জিনিস নয়, এমন কি দামী দামী জিনিস। যার জিনিস নেই সে গরীব নয়, যার জিনিস থেকেও জিনিসের জ্ঞান নেই সে-ই যথার্থ গরীব।'

ঠাকুরের খাওয়া হলো।

ঠাকুর বললেন, 'একবার যাবে রাসমণির বাগান দেখতে?'

'যাবো বৈ কি।' বিদ্যাসাগর কৃতজ্ঞ-কণ্ঠে বললেন, 'আপনি এলেন আর আমি যাবো না?'

ঠাকুর ছি ছি করে উঠলেন। বললেন, 'আমার কাছে নয়, আমি অণুর অণু, রেণুর রেণু। যাবে গঙ্গাতীরে রাসমণির বাগান দেখতে।'

'সেকি কথা?'

'ওহে আমি হচ্ছি জেলে ডিঙি। খাল-বিলেও যেতে পারি, বড়ো নদীতেও যেতে পারি।' বললেন ঠাকুর, 'আর তুমি হচ্ছো জাহাজ। কি জানি, যদি যেতে গিয়ে চড়ায় ঠেকে যাও।'

'না, ঠেকবো কেন? এখন তো ভরা বর্ষা।'

'হ্যাঁ, যদি নবানুরাগের বর্ষা নামে তাহলে আর ভয় নেই। তখন সর্বত্র উত্তাল-জলের উচ্ছলতা। তখন সব চড়া সব অহং-ঢিপি জলে ডোবা। তখন নেই আর মান-অপমান, নেই আর আমি-তুমি। তখন সব একাকার।'

ঠাকুর উঠলেন। বিদ্যাসাগর এগিয়ে দিলেন তাঁকে। প্রণাম করলেন।

ঠাকুর বললেন, 'যদি জানলে ভালোবাসা এসেছে তখনই জানবে ঈশ্বর এসেছেন।'



'শুনেছি দেবেন ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তা করে।' মথুরবাবুকে বলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'তাকে ভারী দেখতে সাধ হয়। তার বাড়িতে নিয়ে যাবে একদিন?'

'নিয়ে যাবো।' এক কথায় রাজি হলেন মথুরবাবু।

'তোমার সঙ্গে তার আলাপ আছে?'

'বাঃ, আমরা যে একসঙ্গে পড়েছি হিন্দু কলেজে। একসঙ্গে মানে



শ্রীরামকৃষ্ণ ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

এক ক্লাসে।' মথুরবাবু বলেন, 'তার সঙ্গে আমার খুব জানাশোনা।'

'তবে একদিন নিয়ে চলো সঙ্গে করে।' শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে ঝরে পড়লো ব্যাকুলতা।

'ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার—তুমি সেখানে যাবে কি। কতোবড়ো রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি। তার বাবা দ্বারকানাথ ঠাকুরের রাজতুল্য বিত্ত। বলতেই বলে প্রিন্স দ্বারকানাথ। কতো তাদের জাঁকজমক, কতো তাদের বোলবোলা। তোমাকে সেখানে কে পুঁছবে? দ্বারকানাথ নেই কিন্তু তাঁর বড়ো ছেলে দেবেন্দ্রনাথ তাঁরই মতো হাঁকডেকে লোক। জানো, ব্যবসা করে অনেক টাকা লোকসান দেন দ্বারকানাথ, পাহাড়প্রমাণ ঋণ রেখে যান ছেলের ঘাড়ে। দেবেন্দ্রনাথ শেষ ক্রান্তি পর্যন্ত সেই ঋণ শোধ করে দিয়েছে।

'কলেজে পড়া কৃতবিদ্য ব্যক্তি। কতোবড়ো কর্মী, কতো মহৎ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি স্বদেশের উন্নতির পথে অন্তরায়—এই আন্দোলন চালাচ্ছে ইংরেজ শিক্ষক আর তারই অন্ধ-স্রোতে গা ভাসিয়েছে উগ্রপন্থী ছাত্রের দল। তারই বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো। অগ্রণী এই দেবেন্দ্রনাথ। নিজের ধর্মে অনাস্থা, নিজের সংস্কৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা ও পশ্চিমকে অনুকরণ করবার লালসার বিরুদ্ধে তার অভিযান। তারই জন্যে রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন করলেন আর তার প্রধান ব্যাখ্যাতা দেবেন্দ্রনাথ। ব্রাহ্মধম তো হিন্দুধর্মের বিরোধী বা বিসম্বাদী নয়, আসলে তা হিন্দুধর্মেরই সার, নির্যাস।

'এ নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের কতো লেখা কতো বক্তৃতা।'

'আমি অতোশত জানতে চাই না।' বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'সে ঈশ্বরভক্ত তো?'

'সে ঈশ্বরে শরণাগত। ঈশ্বর বই সে আর কিছু জানে না জীবনে। সে একটি অনির্বাণ ভক্তির প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে। সে প্রদীপে শুধু আলোই নয় দাহও আছে। দুঃখ-দুর্দিনের দাহ কিন্তু সত্যের আলো।

'যে এই দীপ জ্বালায় সে আর ঘুমুতে পারে না। সেই দীপই তাকে

জাগিয়ে রাখে। জাগিয়ে রাখে সতর্ক প্রহরায়। দুর্যোগের ঝোড়ো হাওয়ায় তা না নিবে যায় অকস্মাৎ, আলস্যে ঔদাসীন্যে না স্তিমিত হয়। আর কোনো ভার ভার নয় যেমন এই দীপরক্ষার ভার। তাতে যোগাও নিষ্ঠার তেল, উস্কে দাও উৎসাহের কাঠি দিয়ে, আর তাকে ঘিরে রাখো তোমার বিশ্বাসের দেয়াল দিয়ে। তাই ঘোর কষ্টের দিনে আত্মীয় গেলো, সমাজ গেলো, বিত্ত গেলো, প্রভুত্ব গেলো, নিন্দায় ছেয়ে গেলো দশদিক, ধনী-মানী বন্ধু-স্বজন, সহায়-সম্বল, সব তাকে ত্যাগ করলো, তবু দীপের অকম্প শিখা নিবতে দিলো না কিছুতেই। সেই শিখাকে বুকে করে লোকালয় ছেড়ে ঘুরতে লাগলো অরণ্যে-পর্বতে। সেই আলোকে দেখতে লাগলো রুদ্রের প্রসন্ন মুখ। যিনি ভয়ের ভয় ভীষণের ভীষণ, তাঁর বজ্রমুষ্টির অন্তরালে খুঁজে নিয়েছে বরাভয়ের অমৃত।'

'রাজার ছেলে ঋষি—এমন মহাপুরুষকে দেখবো না স্বচক্ষে?'

'কিন্তু তোমাকে পাত্তা দিলে তো!'

—সংসারাসক্ত বিষয়-মত্ত লোক বিষয় পেয়েও কেন মনে যথার্থ সুখ পায় না? যে জিনিসের উপর আমাদের সবচেয়ে বেশী মমতা, বেশী আকর্ষণ, যার বিনাশ বা বিচ্ছেদের কল্পনাতেও আমাদের দুঃসহ কষ্ট তা থেকেই কেন আমরা সর্বাগ্রেই বঞ্চিত হই? কেনই বা পার্থিব সুখ অনর্থক ও অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়? কেন মনে হয় একটা উৎকৃষ্টতর সুখ কোথাও আছে। নইলে, কেন—কেন তবু আমাদের ভোগস্পৃহা? এই সব সিদ্ধান্ত করতে গেলে মনে হয় ঈশ্বর এমন বিধান করেছেন যে, শুধু তাঁতেই আমাদের আসল সুখ। শুধু তিনিই সমস্ত তৃপ্তির হেতু। যতোক্ষণ আমরা তাঁকে চোখের সামনে রাখি, তাঁর ইচ্ছার অনুগত হয়ে কাজ করি ততোক্ষণই আমাদের যথার্থ আনন্দ।

আরো কী বলছেন শোনো।

—আমরা ক্ষুদ্র জীব হয়ে যে ঈশ্বরকে জানবার অধিকারী হয়েছি এই আমাদের সর্বোত্তম সৌভাগ্য। কিন্তু এই মহত্তম অধিকারের উপযুক্ত হতে হলে আমাদের সর্বভাবে পবিত্র হতে হবে। যেমন ভদ্র সমাজের

উপযুক্ত হবার জন্য ভদ্র হতে হয়, সাধুর সঙ্গে বসবাসের জন্য সাধু হতে হয় তেমনি সেই পবিত্র-স্বরূপের সান্নিধ্য পেতে হলে পবিত্র হওয়া চাই। বাহ্যিক সাধুভাব প্রকাশ করতে পারলে সাধুর সঙ্গে কখনো-কখনো বিনয় রক্ষা করা যায় বটে কিন্তু পরমেশ্বরের সকাশে সেরূপ হবার নয়। সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বরের কাছে বিনয় রক্ষা করতে গেলে মন, বাক্য ও কার্য যুগপৎ পবিত্র রাখা দরকার।

'তবে? এমন সুন্দর যার কথা, এমন গভীর যার ঈশ্বর অনুভব, চলো, তাকে দেখে আসি দু'চোখ ভরে। তাকে দেখে আসাও পুণ্য।'

'যদি তোমাকে ঢুকতে না দেয় বাড়িতে? তুমি কোথাকার কে এক হেঁজিপেঁজি লোক—' মথুরবাবু নিরস্ত করতে চাইলেন।

হাসলেন শ্রীরামকৃষ্ণ: 'যদি ঢুকতে না দেয় ফিরে আসবো। অন্তত দেখে আসবো তো বাড়িটা। তার বাড়িটাই তো তীর্থ।' তারপর বললেন আশ্বাসের সুরে, 'তা হয় না। পারবে না আমাকে ফিরিয়ে দিতে। যদি শোনে আমিও ঈশ্বর-ঈশ্বর করি—কাছে ডেকে নেবে হাত বাড়িয়ে, আনন্দের কথা শোনাবে।'

নিয়ে গেলেন মথুরবাবু। একেবারে দেবেন্দ্রনাথের কামরায়।

'চিনতে পারো?'

'আরে, মথুর না? চেহারাটা একটু বদলেছে দেখছি। ভুঁড়ি হয়েছে।' হাসির রেখাটুকু মিলিয়ে যেতেই উৎসুক চোখে জিগ্যেস করলেন দেবেন্দ্রনাথ: 'ইনি কে?'

'ইনি ঈশ্বর-ঈশ্বর করে পাগল।' তোমাকে দেখতে এসেছেন।'

কে কাকে দেখে!

তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলেন দেবেন্দ্রনাথ।

'দেখি তোমার গা।' মুখভাবে প্রসন্ন বন্ধুতা, সহজ সুরে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আশ্চর্য, পারলেন বলতে। এতোটুকু কুণ্ঠা হলো না। আরো আশ্চর্য দেবেন্দ্রনাথের ব্যবহার। অনায়াসে তিনি গায়ের জামা তুলে ধরলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেখলেন দেবেন্দ্রনাথের গায়ের রং গৌর, তাব উপর এক-রাশ সিঁদুর ছড়ানো।

তার মানেই দেবেন্দ্রনাথের দিব্যভাব উপস্থিত। তিনি এসেছেন ঈশ্বর-সান্নিধ্যে। আগুনের সামনে এসেছেন বলেই তাঁর গায়ে এই সতেজ রক্তিমা।

ঠিক লোকের কাছেই এসেছি। পাশে বসে পড়লেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বললেন, 'আমাকে কিছু বলো।'

'আমি কী বলবো!'

'না, বলো। তুমি কতোবড়ো পণ্ডিত। সমস্ত বেদ-উপনিষদ তোমার নখদর্পণে। এ পাণ্ডিত্যও তোমার প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ। বলো কিছু, শুনি। ঈশ্বরীয় কথার কি কিছু শেষ আছে? যতো বলবে ততো নতুন।'

বলতে লাগলেন দেবেন্দ্রনাথ: 'এই জগৎ যেন একটা বিরাট ঝাড় লণ্ঠন, আর জীব হচ্ছে এক-একটি ঝাড়ের দীপ। এ জগৎ কে জানতো? ঈশ্বর মানুষ করেছেন তাঁর মহিমা প্রকাশ করবার জন্যে। ঝাড়ের দীপ না থাকলে সব অন্ধকার, ঝাড় পর্যন্ত দেখা যায় না।'

'আরো একটু বলো।'

'ঈশ্বরের মহিমা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। প্রভাতে আমাদের নিমীলিত নয়ন মুক্ত হওয়া মাত্রই তাঁর চক্ষু আমাদের ওপরে স্থাপিত দেখি। আমরা যদি তাঁর জন্যে ব্যাকুল হই, যদি সরল হৃদয়ে তাঁকে প্রার্থনা করি, যদি ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুতেই আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবারণ না হয়, তবে অন্তরে-বাইরে দূরে-কাছে সকল স্থানেই তাঁর প্রকাশ দেখতে পাই। যখন নিজেকে পবিত্র করি, ঈশ্বরের কাছে মুক্ত করি হৃদয় দ্বার, সতৃষ্ণ হয়ে অন্বেষণ করি তাঁকে, তখন গিরিগুহা, উদ্যান-কানন, নির্জন-সজন সকল কিছুই তাঁতে ভরে ওঠে।

'এবার আপনি কিছু বলুন।' অনুরোধ করলেন দেবেন্দ্রনাথ।

'তুমি কলির জনক, তোমাকে দেখে আমার খুব আনন্দ।' ভাবময়

উজ্জ্বল মুখে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'জনক এদিক-ওদিক দু'দিক রেখে খেয়েছিলো দুধের বাটি। তুমি সংসারে থেকেও ঈশ্বরে মন রেখেছো, তুমিই তো বাহাদুর, তুমিই তো বীরপুরুষ! তাই তো তোমাকে আমার দেখতে আসা।

'জনক একদিকে নিজের হাতে লাঙল নিয়ে চাষ করছে, আরেক দিকে দেশদেশান্তর থেকে আসা জ্ঞানপিপাসুদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছে।'

'আরো একটু বলুন।'

'এক হাতে কাজ করো আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো। কাজ শেষ হলে দু'হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।

'যুদ্ধ যখন করতেই হবে, সংসারীদের বলি, কেল্লায় মানে সংসারে থেকেই যুদ্ধ করা সহজ। মাঠে দাঁড়িয়ে, মানে সংসার ছেড়ে এসে যুদ্ধ করার অনেক বিপদ। যদি খেতে না পাও ঈশ্বর-টিশ্বর সব ঘুরে যাবে।

'যা চাও তাও তাই কাছে রয়েছে। অথচ লোকে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। ব্যস্তবাগীশ লোক কাছের জিনিসও দেখতে পায় না। একজন গামছা খুঁজে খুঁজে তারপর দেখে কাঁধেই রয়েছে। আরেকজন, শোনোনি বুঝি, তামাক খাবে বলে অনেক রাত্রে এক প্রতিবেশীর বাড়ি টিকে ধরাতে গেছে। কিন্তু তারা তখন সব ঘুমিয়ে। অনেকক্ষণ ধরে দরজা ঠেলাঠেলি করায় একজন বেরিয়ে এসে জিগ্যেস করলো—কি গো, এতো রাত্রে কি মনে করে? তখন সেই লোক বললো, আরে ভাই, জানো তো তামাকের নেশা আছে, তাই এই টিকেখানা ধরাবো বলে এসেছি। দেশলাই আছে? তখন প্রতিবেশী বললো—বাঃ, তুমি তো বেশ লোক। এতো রাত্রে দোর ঠেলাঠেলি করে আমাদের ঘুম ভাঙালে। তোমার হাতেই তো লণ্ঠন।'

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করলেন, 'আপনাকে আসতে হবে আমাদের উৎসবে।'

'সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। দেখছো তো আমার অবস্থা।' বেশবাসের দিকে ইঙ্গিত করলেন: 'কখন কীভাবে তিনি রাখেন কিছু ঠিক নেই।'

'বেশ তো, ধুতি আর উড়ুনি পরে আসবেন। জামা-টামা নাই পরলেন। আপনাকে কেউ কিছু বললে আমার কষ্ট হবে।'

'তা পারবো না। আমি পারবো না বাবু হতে।'

মথুরবাবু আর দেবেন্দ্রনাথ হাসতে লাগলেন।

দেবেন্দ্রনাথ তখন আছেন গঙ্গার উপর নৌকায়, উত্তেজিত ঝড়ের মতো তাঁর নিভৃতকক্ষে ঢুকে পড়লো নরেন। জিগ্যেস করলো, 'আপনি দেখেছেন ঈশ্বরকে?'

'আমি?' অভিভূতের মতো তাকালেন দেবেন্দ্রনাথ।

'দেখলে আপনিই তো দেখবেন। আপনি বর্তমান বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু।' প্রগাঢ়স্বরে বললো নরেন, 'আপনি মহর্ষি।'

'কিন্তু আমি দেখলে তোমার লাভ কি?' বললেন মহর্ষি, 'তোমাকে নিজে দেখতে হবে।'

'কোত্থেকে দেখবো?' বিশাল চোখে তাকিয়ে রইলো নরেন।

'দেখবে, দেখবে—তোমার এমন যোগীচক্ষু, তুমি দেখবে না?'

যোগীচক্ষু দিয়ে আমি কী করবো? আমি চর্মচক্ষে দেখতে চাই ঈশ্বরকে। আর, এক্ষুণি—এক্ষুণি। দেরী করবার আমার সময় নেই। তোমরা কেউ যদি ঈরশ্বকে দেখে থাকো, আমাকে দেখিয়ে দাও। একজন পারলে কেন আরেকজন পারবে না?'

পারো, কেউ পারো দেখাতে?

আমি পারি।

তুমি পারো, কে তুমি?

আমি কেউ না, কিছু না। আমি মুখখু গেঁয়ো পুজুরী বামুন। আমি দক্ষিণেশ্বরে থাকি। তুই আয় আমার কাছে। আমি কতোদিন ধরে তোর জন্যে পথ চেয়ে বসে আছি। তোকে আমি দেখাবো ঈশ্বর।



বিদ্যাসাগরের স্কুলে ভর্তি হয়েছে শিবনাথ। ন-দশ বছর বয়স, নাদুস-নুদুস চেহারা। বাপ-মা ডাকে ভোঁদড় বলে।

স্কুলে কী-একটা দুষ্টুমি করেছে শিবনাথ। ধরা পড়ে গিয়েছে। স্বয়ং বিদ্যাসাগরই ধরেছেন, 'এসো আমার ঘরে।'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে শিবনাথ বিদ্যাসাগরের ঘরে এসে ঢুকলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শিবনাথ শাস্ত্রী



কোণে দাঁড় করালেন। একটা পাতলা পেঁ[illegible]ার কাটার দিয়ে পেটের উপর মারলেন দু'ঘা।

এই শাস্তি ?

না। আরও আছে। শিবনাথের ভুঁড়ি দেখে বিদ্যাসাগরের লোভ হলো। তিনি তাঁর ডান হাতের আঙুল দুটো চিমটের মতো করে শিবনাথের ভুঁড়ির মাংস টেনে ধরলেন। আসলে এটা আদর।

মামা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাড়িতে থেকে পড়ে শিবনাথ। দ্বারকানাথ বিদ্যাসাগরের বন্ধু। সেই সুবাদে বিদ্যাসাগর প্রায়ই আসেন দ্বারকানাথের বাড়ি। এসেই শিবনাথের খোঁজ করেন। শিবনাথ কাছে এসে দাঁড়ালেই তার ভুঁড়িতে চিমটি কাটেন।

'পালা! পালা! বিদ্যেসাগর এসেছে।'

শিবনাথের কানে এ খবর পৌঁছোলেই সে হাওয়া হয়ে যেতো।

পিসতুতো ভাই রামযাদব চক্রবর্তীর সঙ্গে ঝগড়া করেছে শিবনাথ। মা গোলকমণি ছুটে এসে মাঝখানে পড়ে দু'জনের কান ধরে দু'থাবড়া মেরে ঝগড়া ভাঙিয়ে দিলেন। রামযাদব কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের কাছে গিয়ে নালিশ করলো: 'মামীমা—মায়ে-পোয়ে পড়ে ওরা আমায় মেরেছে।'

আর যায় কোথা! কী ব্যাপার কিছু সন্ধান না করেই রামযাদবের মা গালাগালি শুরু করলেন। সন্ধ্যার দিকে শিবনাথের বাবা হরানন্দ ভট্‌চাজ্ বাড়ি ফিরছেন, গালাগালি শুনে বোনের বাড়ি ঢুকে ব্যাপার কী জেনে নিলেন।

তাড়াতাড়ি শিবনাথকে ভাত বেড়ে দিলো মা। বললো, 'শীগগির খেয়ে চলে যা। ভট্‌চাজ্যি পাড়ায় যে যাত্রা হবে তাই গিয়ে শোন্। সকালবেলায় ফিরিস। ততোক্ষণে কর্তার রাগ পড়ে যাবে।'

'পাজীটা কোথায়?' বাড়ি পৌঁছেই হাঁক দিলেন হরানন্দ।

রান্নাঘরের দরজার দু'কাঠ ধরে পথ আগলে দাঁড়ালেন গোলকমণি। বললেন, 'ঘরে নেই।'

হরানন্দ রান্নাঘরের দিকে এগোলেন না, উঠোনে দাঁড়িয়েই বললেন, 'দা-খানা দাও।'

'কেন, দা কেন?'

'সে কথায় কাজ কী? দাও বলছি।'

গোলকমণি দা বার করে দিলেন। দা নিয়ে চলে গেলেন হরানন্দ।

এ সুযোগে তাড়াতাড়ি আঁচিয়ে বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে পালালো শিবনাথ। একেবারে সেই যাত্রার আসরে।

'সব সময় ভীড়ের মধ্যে থাকবি।' বলে দিলেন গোলকমণি, 'মুখে-মাথায় কাপড় বেঁধে।'

আটটা-সাড়ে আটটা পর্যন্ত কাটলো নির্বিবাদে। শিবনাথের মনে আর ভয় ভাবনা রইলো না। আসরের বাইরে এসে বেড়াতে লাগলো।

কে যেন হঠাৎ পিছন থেকে ঘাড় চেপে ধরলো।

'কে রে?' চমকে ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে পিছন ফিরে তাকালো শিবনাথ। সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেলো। যমের চেয়েও নিকট, বাবা ধরেছেন।

পিঠে দু'ঘা বসিয়ে দিলেন হরানন্দ। বললেন, 'খবরদার, কাঁদতে পারবিনে।'

অসম্ভব, সেই মার খেয়ে না কাঁদা, কান্না গিলে খাওয়া। তবু প্রাণপণ শক্তিতে চুপ করে রইলো শিবনাথ।

বাড়ি নিয়ে গিয়ে শিবনাথকে দাঁড় করালেন উঠোনে। বললেন, 'দাঁড়িয়ে থাক, নড়িসনে, আমি আসছি।'

দা দিয়ে বাঁশের ছড়ি কেটে রেখেছিলেন তাই খুঁজতে লাগলেন হরানন্দ। গোলকমণি যে সে ছড়ি পুকুরের জলে ফেলে দিয়েছেন তা আর তাঁর জানা নেই।

'ওরে পালা, মার খাবার জন্যে কেন দাঁড়িয়ে আছিস বোকার মতো?' আতঙ্কিত আত্মীয়ের দল সমস্বরে বললো শিবনাথকে।

শিবনাথও অটল। বললো, 'না, বাবা আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছেন, আমি দাঁড়িয়ে থাকবো। নড়বো না একচুল।'

আধঘণ্টা কেটে গেলো, ছড়ি না পেয়ে অন্য অস্ত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন হরানন্দ, শিবনাথ ঠায় দাঁড়িয়ে। মারবার সঙ্কল্পে হরানন্দ অটল আর পিতৃ-আজ্ঞা পালন করবে এই বাধ্যতায় শিবনাথও সমাধিনিষ্ঠ।

অবশেষে একটা চেলাকাঠ নিয়ে উদ্যত হলেন হরানন্দ।

রামযাদবের মা—হরানন্দের দিদি, সেই এলো হন্তদন্ত হয়ে। 'ওরে কী সর্বনাশ, এই কাঠের বাড়ি মারলে ছেলে কি আর বাঁচবে?'

কার কথা কে শোনে?

রামযাদবের মা কাড়তে গেলো কাঠ, হুটোপুটি শুরু হয়ে গেলো। দিদিকে ধাক্কা মারলেন হরানন্দ, তিন-চার হাত দূরে ছিটকে পড়লো।

গোলকমণি দাঁড়িয়ে আছেন চিত্রার্পিতের মতো।

'কী দেখছো এদিকে? ছেলে মেরে ফেলতে হয়, মেরে ফেলো। আমার চোখের সামনেই মেরে ফেলো।'

'হ্যাঁ, ফেলবোই তো।' হরানন্দের মাথায় খুন চেপেছে। যারা এগিয়ে এসেছিলো নিরস্ত করতে, মার খেয়ে পিছু হঠলো।

আর শিবনাথ? শিবনাথ মার খেয়ে মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়লো।

যখন জ্ঞান হলো, দেখলো তার বাবা ও আরও দু'জন লোক তার গায়ে তার্পিন তেল মাখিয়ে দিচ্ছেন। মা বাড়ির কাছের জঙ্গলে পড়ে আছেন।

'বাবারে, তুই কি আছিস?' পাগলের মতো পড়ি-কি-মরি করে ছুটে এলেন গোলকমণি।

একটু সুস্থ হবার পর শিবনাথ বললো আপন মনে, 'ঝগড়া করে-ছিলাম, আমার দোষ হয়েছিলো। তাই বলে লঘু পাপে এই গুরুদণ্ড দেওয়া কি ঠিক হয়েছে?'

দেখলো, হরানন্দ মাটিতে নাক ঘষে নাকে খত দিচ্ছেন।

যেমন প্রতিজ্ঞায় তেমনি অনুতাপেও ঐকান্তিক।

গ্রামের বালিকা-বিদ্যালয়ে মেয়ে পাঠাতে নিষেধ করে জমিদাররা হুকুমনামা জারি করেছেন। যে পাঠাবে তাকে একঘরে করে ছাড়বে।

'কি, এতো বড়ো স্পর্ধা !' হরানন্দ রুখে দাঁড়ালেন : 'আমার ছেলে মেয়ে পড়বে কি পড়বে না তা অন্য লোকে ঠিক করে দেবে ? অসম্ভব।'

'ওটা তো ব্রাহ্মদের স্কুল।' জমিদার তরফ পিঠে হাত বুলুতে চাইলো : 'আর আপনি একজন সনাতনপন্থী হিন্দু, সদাচারী ব্রাহ্মণ।'

'তাতে কী !' নিজের প্রতিজ্ঞায় নিশ্চল হরানন্দ, বললেন : 'তাতে মেয়ে পড়ানো না পড়ানোয় কী এসে যায় ?'

সব মেয়ে চলে গিয়েছে স্কুল ছেড়ে। শুধু দু'জন আছে খুঁটি ধরে। শিবনাথের দুই বোন। আর তৃতীয়জন—বিদ্যালয়ের পণ্ডিত।

শিবনাথ বড়ো হয়েছে, ভবানীপুরে চৌধুরীদের বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ছে। বাবা একখানা সরকারী কাগজ পাঠিয়েছেন, আদেশ করেছেন নিজে গিয়ে স্কুল ইনস্পেক্টর উড্রো সাহেবের হাতে দিয়ে এসো।

দরিদ্র অবস্থা, বুট জুতো কেনার সঙ্গতি নেই শিবনাথের, চটি পায়েই উড্রো সাহেবের আপিসে এসে উপস্থিত হলো শিবনাথ। কাগজখানা উড্রো সাহেবের দিকে বাড়িয়ে ধরলো। উড্রো তা নিলে না। রূঢ় কণ্ঠে জিগ্যেস করলো, 'তুমি আপিস ঘরের বাইরে জুতো ছেড়ে আসনি কেন ?'

'কৈ, এ নিয়ম তো জানতাম না।'

শিবনাথ সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

'তুমি জুতো পায়ে ঘরে ঢুকে আমাকে অপমান করেছো।' গম্ভীর হ.লা উড্রো : 'জুতো ছেড়ে এসো বলছি।'

'খালি পায়ে ঢুকবো ?'

'হ্যাঁ, খালি পায়ে।'

'এমন অদ্ভুত কথা তো শুনিনি !' বললো শিবনাথ : 'ঘরের মধ্যে আপনার পায়ে জুতো, আপনার কেরাণীবাবুর পায়ে জুতো, আর আমিই জুতো ছাড়া হয়ে থাকবো ? বেশ, আপনারা খালি-পা হোন, আমিও খালি-পা হবো।'

'আমাদের যে বুট জুতো, আর তোমার—'

'আমারটা চটি। বুট হলে আপনার মান থাকতো আর চটি বলেই

আপনার মান গেছে, এ আমি মানতে প্রস্তুত নই। বললো শিবনাথ, 'জুতো জুতোই, বুটে-চটিতে কোনও তফাৎ নেই।'

'তুমি জুতো ছাড়বে কিনা বলো।' সাহেব হুমকে উঠলো।

'মাপ করবেন। পারবোনা ছাড়তে।'

'তবে যাও, তোমার চিঠিও নেবো না।'

'এই আপনাদের টেবিলের ওপর রইলো। নেন নেবেন, না নেন ফেলে দেবেন। আমার কাজ আমি করে গেলাম।' বলে টেবিলের উপর চিঠি রেখে শিবনাথ বেরিয়ে গেলো।

সেই শিবনাথ পৈতে ফেলে দিয়ে ব্রাহ্ম হলো। কেশব সেনের-কাছে দীক্ষা নিলো।

হরানন্দ ছেলেকে তাড়িয়ে দিলেন, ভাড়াটে গুণ্ডা রাখলেন এ-মুখো হলে যেন লাঠি-পেটা করে গ্রামের বার করে দেওয়া হয়।

তবু লুকিয়ে মাঝে মাঝে এসে মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে যায়।

সেদিন মার কাছে বসে মুড়ি খাচ্ছে শিবনাথ।

তাই দেখে একজন স্ত্রীলোক বললো, 'ওমা, সে কী গো? মুড়ি খায়? কথা কয়? তবে কে বলে ও আমাদের মধ্যে নেই?'

পাড়ার ছোটো একটা মেয়ে ছুটে এসে খবর দিলো, লাঠিয়াল আসছে। তাড়াতাড়ি মাকে প্রণাম করে খিড়কির দোর দিয়ে পালিয়ে গেলো শিবনাথ।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ তার ছেলেকে ঠেঙাবার জন্য মাইনে দিয়ে লাঠিয়াল রাখছে—কতোবড়ো স্বধর্মনিষ্ঠ হলে এ সম্ভব, ভাবতে অভিভূত হলো শিবনাথ। ভাবতো, বাবার এই প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা যদি আরও একটু বেশী হয়ে থাকতো তার মধ্যে।

বাবার ছেলে বলেই শিবনাথও বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হলো না তার আদর্শ থেকে। দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা নির্যাতন—কিছুতে না। আঠারো-উনিশ বছর বাবা তার মুখদর্শন করেননি, বাক্যালাপ করেননি, তবুও না। শিবনাথও তার নিজের বিশ্বাসে নির্বিচল।

হরানন্দ বিদ্যাসাগরকে বললেন: 'মানুষ যেমন ছেলে যমকে দেয় তেমনি ছেলে কেশবকে দিয়েছি।'

শুনে বিদ্যাসাগর কেঁদে ফেললেন।

পথে একদিন শিবনাথের সঙ্গে দেখা। 'হ্যাঁরে, তোর কেমন করে চলে?' জিগ্যেস করলেন বিদ্যাসাগর।

'খুব কষ্টে চলে, শুধু ক'টা স্কলারশিপের টাকা।'

তখন আবার একবার চোখ ভিজে উঠলো বিদ্যাসাগরের। একবার বাপের দুঃখে দুঃখ। আবার ছেলের কষ্টে ক্লেশ।

কিন্তু শিবনাথকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের মহা আনন্দ।

'এই যে, শিবনাথ।' সহাস্যমুখে বললেন ঠাকুর, 'তুমি ভক্ত, তোমাকে দেখে ভারী আনন্দ হয়। গাঁজাখোরের স্বভাব—আরেকজন গাঁজাখোরকে দেখলে ভারী খুশি হয়।'

নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম হলে কী হয়, শিবনাথের খুব ভালো লাগে রামকৃষ্ণকে। ধর্ম সাধনার জন্য চূড়ান্ত ক্লেশ করছেন—এতো ক্লেশ আর কেউ করেছেন বলে জানা নেই। তাছাড়া ধর্ম মানেন, সমস্ত মত-বাদকেই শ্রদ্ধা করেন, সমস্ত মানুষকেই ভালোবাসেন, বুকে ধরেন। এমন লোক আর দু'টি হয় না।

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিগ্যেস করলেন, 'মশায়, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?

'তাঁর ইতি করা যায় না।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'তিনি নিরাকার, আবার সাকার। ভক্তের জন্য সাকার। যারা জ্ঞানী, যারা জগৎকে স্বপ্ন বলে দেখছে, তাদের পক্ষে নিরাকার। ভক্ত জানে আমি একটি জিনিস। তাই ভক্তের কাছে ঈশ্বর ব্যক্তি হয়ে দেখা দেন। এই ধরো না শিবনাথ, শিবনাথের দিকে প্রীতিপূর্ণ চোখে তাকালেন ঠাকুর: 'যতোক্ষণ ও সভায় আসেনি ততোক্ষণ ও নিরাকার—কতো তার নাম আর গুণের কথা রয়েছে। আর যেই সে এসে পড়লো, সাকার হয়ে উঠলো, অমনি সব কথা বন্ধ। তখন তার দর্শনেই সুখ।'

সবাইকে প্রণাম করছেন ঠাকুর। প্রণাম করতে করতে বলছেন, 'জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদীর বিকারবাদীর চরণে প্রণাম, আগেকার ব্রাহ্মজ্ঞানীদের, ব্রাহ্মসমাজের ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম।'

এক খৃষ্টান পাদ্রী বন্ধুকে নিয়ে এসেছে শিবনাথ। বললো, 'আমার এই খৃষ্টান বন্ধু আপনাকে দেখতে এসেছেন।'

ঠাকুর অমনি প্রণত হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বললেন, 'যীশু খৃষ্টের চরণে আমার শত শত প্রণাম।'

'যীশুকে যে আপনি প্রণাম করছেন তাঁকে আপনি কী মনে করেন?' পাদ্রী প্রশ্ন করলো।

'ঈশ্বরের অবতার মনে করি।'

'যেমন আপনাদের কৃষ্ণ, রাম, তেমনি?'

'হ্যাঁ, তেমনি। ভগবানের অবতার অসংখ্য। যীশুও এক অবতার।'

'অবতার বলতে আপনি কী বোঝেন?'

'কী বুঝি? শুনেছি কোনো কোনো জায়গায় সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়, ধরবার ছোঁবার মতো হয়। তেমনি অনন্ত সমুদ্রের মতো অনন্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে, কোনোও বিশেষ কারণে কোনোও এক বিশেষ স্থানে ঐশী শক্তি জমাট বেঁধে মূর্তি ধারণ করলো. ধরবার ছোঁবার মতো হলো, সেইটেই ভগবানের অবতার।'

ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হয়ে গেলো পাদ্রী। ধর্মের সার্বভৌমিকতা শিবনাথও উপলব্ধি করলো।

'শিবনাথকে দেখলে আমার আনন্দ হয়।' বলছিলেন ঠাকুর, 'যেন ভক্তিরসে ডুবে আছে। আর যাকে অনেকে গোণে মানে তাতে নিশ্চয়ই ঈশ্বর শক্তি প্রকাশিত।'

শিবনাথকে দেখবার জন্য অস্থির হয়েছেন ঠাকুর। ব্রাহ্ম পাড়ার মধ্যে বাড়ি, চলো, দেখে আসি ভক্তকে। দ্বারপ্রান্তে এসে শুনলেন শিবনাথ বাড়িতে নেই।

'কী হবে কেমন করে থাকবো তাকে না দেখে ?'

'কেন, শিবনাথকে চান কেন ?'

'কেন চাই ? যে ঈশ্বর চিন্তা করে তাকে দেখাও যে কতকটা ঈশ্বরকে দেখা।'

সরকারী চাকরী ছেড়ে দিয়েছে শিবনাথ। বিদ্যাসাগরকে একজন এসে জানালো : 'মশাই, পাজীটা সুখের চাকরীটা ছেড়ে দিয়েছে।'

বিদ্যাসাগরও তো চাকরী ছাড়া। তিনি হেসে বললেন, 'কেন বলছো ? সে তো আমার মনের মতোই কাজ করছে।'

কতো না জানি কষ্টে আছে শিবনাথ, কষ্টে থেকেও ভগবানে শুধু লগ্ন নয়, মগ্ন হয়ে আছে—ব্যাকুল হয়ে রামকৃষ্ণ চলে এসেছেন।

কিন্তু হরানন্দ, পিতৃদেব কি আসবেন না ?

রোগশয্যায় পড়ে বাবাকে চিঠি লিখলো শিবনাথ। আগে আগে চিঠি গেলে ছিঁড়ে ফেলতেন, এবার কেন কে জানে, খুলে ফেললেন চিঠিটা। জীবন সংশয় অসুখ। পায়ের ধুলো চেয়েছে।

দেখা না হোক, চিকিৎসার বন্দোবস্তটা করে দিয়ে আসি। স্ত্রীর গয়না বাঁধা দিয়ে টাকা যোগাড় করে বেরুলেন।

'বাবা এলেন না কেন ?' মাকে কাছে পেয়ে আকুল হয়ে জিগ্যেস করলো শিবনাথ।

'কোবরেজ ডাকতে গিয়েছিলেন।'

যথাসময়ে কোবরেজ এলো। কিন্তু বাবা কৈ ?

কবিরাজ বললো, 'উনি রাস্তার একটা দোকানে বসে আছেন।'

শিবনাথ ভাবতে লাগলো, বিষয়-সম্পত্তি না থাক, বাবার এই তেজস্বিতা, এই সত্যানুরাগ, এই দৃঢ়চিত্ততা—এই উদার সহৃদয়তার যেন উত্তরাধিকারী হই।

'ঈশ্বরের জন্যে ভক্ত সব ছাড়তে পারে। দেখো বিশ্বনাথকে।' বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'ভক্তিতে দুই চোখ ছানাবড়া হয়ে আছে। আর জানবে ভক্তই সার কথা, শেষ কথা।



মাইকেল মধুসূদন ব্যারিষ্টার হয়ে এসেছে। উগ্র সাহেব। খ্রীষ্টান।
তারপর, আবার নাকি মদ খায়।
সে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে।
শ্রীরামকৃষ্ণের ডাকে নয়, মথুরবাবুর ছেলে দ্বারিকের ডাকে।
মথুরবাবু তখন নেই, বড়ো ছেলে দ্বারিকই বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা



শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাইকেল

করছে। যা বিষ হয়, তাই বিষয়। মামলা বেধেছে পাশে বাঁরুদ ঘরের সাহেবদের সঙ্গে।

সে মামলায় নতুন ব্যারিষ্টার মধুসূদনকে ডাকো। তাকেই কাগজ-পত্র বুঝিয়ে দাও। যা ফি চায় তাই দেবো।

দপ্তরখানার পাশে বড়ো ঘরে বসিয়েছে মধুসূদনকে। দ্বারিক নিজেই উদ্যোগী হয়ে দেখাচ্ছে কাগজপত্র। কিন্তু মধুসূদন যেন কেমন উন্মনা। দৃষ্টি যেন দেশান্তরী।

মামলার নথিতে মন না দিলে ব্যারিষ্টারি করবে কি? দ্বারিক বিশ্বাস চঞ্চল হয়ে উঠলো।

হঠাৎ কাগজ থেকে চোখ তুলে মধুসূদন বললো, 'শ্রীরামকৃষ্ণকে একবার দেখতে চাই?'

'ও! এই কথা? এখুনি ডাকছি ঠাকুরকে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে খবর গেলো। নিজের ঘরটিতে চুপ করে বসে আছেন, দপ্তরের আমলা এসে বললো, 'বাবু তলব করেছেন।'

'কেন হে, ব্যাপার কি?'

'মাইকেল মধুসূদনের নাম শুনেছেন?'

'তা আর শুনিনি!'

'সে এসেছে, বাবুদের বড়ো ঘরটায় বসে আছে। আপনাকে একবারটি দেখতে পায়।'

'ওরে বাবা!' ভয়ে আঁতকে উঠলেন রামকৃষ্ণ: 'দুর্দান্ত সাহেব, সর্বক্ষণ হ্যাট্-ম্যাট্-ক্যাট্ বলছে, তার সামনে আমি গিয়ে দাঁড়াবো কি! আমি মুখখু-সুখখু মানুষ, এ-বি-সি-ডির ধার ধারি না। কি কথা বলতে কি কথা বলবো তার ঠিক নেই।'

'তা জানি না। বাবুর হুকুম, আমার জানাবার কথা, আমি তাই জানিয়ে দিলাম।'

'ওরে হৃদে, তুই যা।' ভাগনে হৃদয়রামের উদ্দেশ্যে সজোরে হাঁক পাড়লেন ঠাকুর।

হৃদয়রাম অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। বললো, 'সেকি কথা। দেখতে চায় আপনাকে, আর আমি গিয়ে সামনে দাঁড়াবো ?'

বালকস্বভাব ঠাকুর সহাস্য মুখে বললেন, 'ও একই কথা। তুইও এখানকার লোক, আমিও এখানকার লোক। একজন গেলেই হলো।'

মামার কথা শুনে গুটি গুটি গেলো হৃদয়রাম।

দ্বারিক বিশ্বাস তেড়ে এলো : 'তুমি এসেছো কি করতে ? তোমাকে কে চায় ? তোমাকে দিয়ে কি হবে ?'

'মামা যে বললেন—'

'মামাকে পাঠিয়ে দাও।' দ্বারিক গর্জে উঠলো।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো হৃদয়রাম। বললো, 'আমাকে দিয়ে হবে না। আপনাকে যেতে হবে।'

'কি বিপদ! আমি যাবো কি!' ঠাকুর চারিদিকে তাকাতে লাগলেন। 'আমি কি একটা সাহেবের সঙ্গে কথা কইবার যোগ্য।' আমার কি সেরকম পোশাক-আশাক কিছু আছে, না, কি আমি ইংরিজি জানি ?'

সামনে দেখতে পেলেন নারায়ণ শাস্ত্রীকে। রাজপুত পণ্ডিত, নবদ্বীপে এসেছিলো ন্যায় পড়তে। সাত বছর ন্যায় পড়ে দেশে ফিরে যাবার মুখে এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। এসে দেখছে, এতোদিন করেছে কি, পড়েছে কি, মূর্তিমান সিদ্ধান্ত যে এইখানে! সমস্ত তর্কের নিষ্পত্তি সমস্ত জিজ্ঞাসার মীমাংসা! ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিলো নারায়ণ।

নারায়ণকে ডাকলেন ঠাকুর। বললেন, 'একা যেতে ভয় করছে। তুমি সঙ্গে চলো।'

'আমি গিয়ে কি করবো ?' নারায়ণ আপত্তি তুললো।

'তবু তুমি পণ্ডিত মানুষ, দুটো কথা কইতে পারবে। তর্ক তুললে পারবে সামাল দিতে। আমি আকাট, হ্যাঁ-না কিছুই বলতে পারবো না। তুমি সঙ্গে থাকলে তবু খানিকটা বল হবে।'

'চলুন—'

নারায়ণ শাস্ত্রীকে আগে রেখে এগুতে লাগলেন ঠাকুর।

কিন্তু মধুসূদনের কাছ পৌঁছেই বেসুর ধরলো নারায়ণ। সরাসরি জিগ্যেস করে বসলো, 'তুমি ধর্ম ছেড়েছো কেন?'

প্রথমেই এমন একটা প্রশ্ন করতে হয়? তাও এমন রুষ্ট স্বরে? ঠাকুর যেন ফাঁপরে পড়লেন।

কি বলবে ঠিক যেন কিছু বুঝে উঠতে পারছে না মধুসূদন। কাতর চোখে শূন্যে তাকিয়ে রইলো।

নারায়ণ কি তবু নিরস্ত হয়? একই প্রশ্নবান আবার ছুঁড়ে মারলো: 'কেন ছাড়লে নিজের ধর্ম? হিন্দু ধর্ম?'

মধুসূদন নিজের পেটে হাত রাখলো। বললো, 'পেটের জন্যে।'

'পেটের জন্যে বাপ-ঠাকুর্দার ধর্ম ছাড়লে তুমি?' নারায়ণ শাস্ত্রী বোমার মতো ফেটে পড়লো: 'এই দু'দিনের সংসারে পেটের দায়ে ধর্ম ছাড়া? কি হতো ধর্মচ্যুত না হলে? কি হতো?'

'মরে যেতাম।' বললো মধুসূদন।

'না হয় মরেই যেতে। ধর্মের চেয়ে তুচ্ছ দেহটা বড়ো হলো?' নারায়ণ হুঙ্কার করে উঠলো: 'যে পেটের জন্যে ধর্ম ছাড়ে তার সঙ্গে কথা কইবো কি, তার মুখদর্শন করাও পাপ।' বলে নারায়ণ চলে গেলো ঘর ছেড়ে।

ঠাকুর একা পড়লেন। অবরোধের যে প্রাচীর সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তা সরে যেতেই পড়লেন একেবারে ফাঁকা মাঠে।

পরিপূর্ণ চোখে মধুসূদন তাকালো ঠাকুরের দিকে। এমন সুন্দর মানুষ তো কই আর দেখিনি। চোখ ভরা করুণা আর ক্ষমা, সুখ ভরা আর্তিহরণ প্রসন্নতা।

বললো, 'আপনিও কি আমাকে ত্যাগ করবেন?'

ঠাকুর সহাস্যে তাকিয়ে রইলেন। সে হাসির অর্থ—আমি কি কাউকে ত্যাগ করতে পারি? বললেন, 'অশ্রদ্ধেয় বলে অপাংক্তেয় বলে কেউ কি আছে আমার কাছে?'

'তাহলে আমাকে কিছু বলুন। কিছু উপদেশ দিন।' মিনতিময় চোখ তুলে মধুসূদন তাকালো ঠাকুরের দিকে।

ঠাকুর কি বলতে যাচ্ছেন, সহসা কে তাঁর মুখ চেপে ধরলো।

একি, তিনি কথা কইতে পারছেন না কেন, কে তাঁর মুখ চেপে ধরলো হঠাৎ ?

আর কে! স্বয়ং কালী সনাতনী।

'একি, আমাকে দুটো কথা কইতে দিবিনে ?'

না, যে ধর্মদ্রোহী, তার সঙ্গে আবার কি কথা! তাকে আবার কিসের সান্ত্বনা, কিসের উপদেশ! প্রত্যাখ্যান করে দাও।

'কিছু বলুন আমাকে।' সস্পৃহ চোখে তাকিয়ে রইলো মধুসূদন।

'আশ্চর্য, আমি তো বলতে চাই, কিন্তু কে যেন আমার মুখ চেপে ধরেছে।' ব্যথায় যেন ছটফট করে উঠলেন ঠাকুর।

মনের মধ্যে ম্লান হয়ে গেলো। আমি এতোই অকিঞ্চন ? শুধু আমারই কি স্থান নেই পদাশ্রয়ে ?

মা, কৃপা কর্। তুই তো সকলের মা। পাপী-তাপী অক্ষম-অধম সকলের অঙ্কদায়িনী। তবে কেন তুই বিমুখ হয়ে থাকবি ? কেন তুই ব্যথার স্থানে উপশমের হাত বুলিয়ে দিবিনে ?

ঠাকুরের মুখ থেকে হাতের বাধা সরে গেলো বুঝি।

ঠাকুর উল্লসিত হয়ে উঠলেন। সাহ্লাদ-সুন্দর মুখে বললেন, 'আমাকে কথা কইতে দিচ্ছে না বটে, কিন্তু, দাঁড়াও, তোমাকে গান শোনাই তুমি শান্তি পাবে।'

হৃদয়ের ভালোবাসা বৈরীরীতির ধার ধারে না। ঈশ্বরকে কী পূজা করবো যদি মানুষকে না ভালোবাসতে পারি ? ধর্মদ্রোহীর মন্দিরে জায়গা না হোক, জায়গা হবে হৃদয়ে, যখন সে দ্রোহের মধ্যে দুঃখের প্রদাহ।

মাইকেলের রক্তাক্ত ক্ষতে আরামের প্রলেপ পড়লো। অশ্রুতে ভরে উঠলো দু'নয়ন।



প্রশান্তদীপ্ত সুন্দর সুপুরুষ, মুখশ্রীতে ঈশ্বর বিশ্বাসের কান্তি। কণ্ঠস্বরে যেমন ভক্তির মাধুর্য তেমনি প্রতিভার তেজ। বাংলা ইংরিজি দু'ভাষাতেই চমৎকার বক্তৃতা দেয়। যেমন তার বর্ণচ্ছটা তেমনি বিন্যাসচাতুর্য। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডানহাত হচ্ছে এই কেশবচন্দ্র। বাকপতি বিবুধেশ্বর। ঈশ্বর-মাতোয়ারা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র



রাজপুত পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রীকে রামকৃষ্ণ বললেন, 'লোকটার খুব নাম ডাক শুনছি। তুমি গিয়ে একবার দেখে আসবে?'

নারায়ণ শাস্ত্রী জ্যোতিষ জানতো, দেখে এলো কেশবকে।

'কেমন দেখলে?'

'খাঁটি লোক। জ্ঞানসিদ্ধ।'

দেবেন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ধর্মসভায় রামকৃষ্ণ গিয়ে দেখলেন বেদীর উপর অনেক লোক বসেছে, মধ্যিখানে কেশব। একমাত্র কেশবই কাষ্ঠবৎ। রামকৃষ্ণ দেখলেন, যতোজন ধ্যান করছে তার মধ্যে কেশবই গভীরগামী। মথুরবাবুকে বললেন, 'শুধুই কেশব ছোকরারই ফাতনা ডুবেছে।'

তখন ভাগ্নে হৃদয়কে নিয়ে গেলেন বেলঘরে, কেশবের সঙ্গে দেখা করতে। কেশব আমার সঙ্গে দেখা করতে আসুক এই ভাব নয়। আমিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যাই কেশবের কাছে। কেশব ঈশ্বরের কথা নয়, বহু লোক তাকে মানে-গোনে, সেই তো তীর্থভূত।

কেশব সশিষ্য পুকুরের বাঁধাঘাটে বসে আছে, হৃদয় কাছে এসে বললো, 'আমার মামা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'কে আপনার মামা?'

'দক্ষিণেশ্বরে থাকেন। আপনি এখানে হরিনাম করতে এসেছেন জেনে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলেন।'

'নাম কী?'

নাম বললো হৃদয়।

'কোথায় তিনি?' ব্যস্ত হয়ে উঠলো কেশব।

'গাড়িতে বসে আছেন।'

'নিয়ে আসুন নামিয়ে।'

হৃদয় তখন নিয়ে এলো রামকৃষ্ণকে। সবাই উদগ্র উৎসুক হয়ে তাকালো। এই রামকৃষ্ণ? সাধারণ পাঁচজনেরই একজন। কিংবা হয়তো তারও চেয়ে নগণ্য।

কেশব কোন্‌জন, ঠিক বুঝতে পেরেছেন রামকৃষ্ণ। কাছেকালীর বললেন, 'বাবু, তোমাদের কাছে ঈশ্বরের কথা শুনতে এসেছি! তোএরা নাকি দেখেছো ঈশ্বরকে? সে কেমনতরো দর্শন আমাকে একটু বলবে?'

কে বলে সাধারণ-সামান্য! তন্ময়ের মতো তাকিয়ে বললো কেশব, 'আপনি বলুন। যদি কেউ বলবার থাকে তো আপনিই বলবেন।'

'আমি বলবো?' গান ধরলে নরামকৃষ্ণ : 'কে জানে কালী কেমন? ষড়দর্শনে না পায় দরশন—'

গাইতে-গাইতে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন।

আর-সকলে মনে করলো মস্তিষ্কের বিকার, কিংবা মৃগী রোগ আছে হয়তো লোকটার। কিন্তু কেশব বুঝলো রামকৃষ্ণের মুখের এ পবিত্র দিব্য বিভা অলৌকিক দর্শন আর স্পর্শনের সংমিশ্রণ।

হৃদয় প্রণব-মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলো, হরি ওঁ, হরি ওঁ।

বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেলেন রামকৃষ্ণ।

বলতে লাগলেন ঈশ্বরকথা। গিরগিটি কখনো লাল কখনো নীল কখনো সবুজ কখনো হলদে। আবার কখনো কখনো দেখা যাবে এক-দম রং নেই। ঈশ্বরও তেমনি। কখনো সগুণ কখনো নির্গুন। ভক্ত যে রূপটি ভালোবাসে ভগবান সেই রূপটি ধরে দেখা দেন। পরে আবার রূপের বাইরে চলে যান, প্রত্যক্ষের বাইরে। তখন শুধু জ্যোতি, অনুভূতির সমুদ্র।

দুই-ই সত্য। নিরাকারও সত্য। কবীর বলতো, নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা। তুমি কাকে ছেড়ে কাকে রাখবে।

উপাসনার ঘণ্টা পড়লো। এবার সকলের উঠতে হয়।

কিন্তু উঠতে কারু মন চাইলো না। উপাসনার অর্থই হচ্ছে ভগবানের কাছটিতে বসা, আসন নেওয়া। এ কী সবাই এক ভাগ্যবতী উপস্থিতির কাছে বসে নেই?

'সাকারই বলো নিরাকারই বলো, তিনি রয়েছেন এই দেহের মধ্যে।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'হরিণের নাভিতে কস্তুরী, তার গন্ধে সারা বন আমোদ

াছে। কিন্তু হরিণ জানে না কোথায় এই সুগন্ধের উৎস, দিকে দিকে ছুটে বেড়াচ্ছে উদ্‌ভ্রান্তের মতো। তেমনি ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন, মানুষ তাকে জানতে না পেরে ঘুরে-ঘুরে মরছে।'

কেশবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার ভাবনা নেই। তোমার লেজ খসেছে।'

ব্যাখ্যা করে দিলেন। ব্যাঙাচির যদ্দিন লেজ থাকে তদ্দিন সে জলেই থাকে, ডাঙায় উঠতে পারে না। কিন্তু লেজ যখন খসে পড়ে তখন সে জলেও থাকতে পারে ডাঙায়ও উঠতে পারে। তেমনি মানুষের যদ্দিন অবিদ্যার লেজ থাকে তদ্দিন সে সংসার জলেই থাকতে পারে, ব্রহ্মভূমিতে উঠতে পারে না। অবিদ্যা খসে পড়লে মানুষ সংসারেও থাকতে পারে, ঈশ্বরেও থাকতে পারে। তুমি তেমনি সংসারেও আছো ঈশ্বরেও আছো।

তবু বুঝি সংশয় যায় না কেশবের। রামকৃষ্ণকে বাজিয়ে দেখবার জন্য চর পাঠিয়েছে দক্ষিণেশ্বরে। দিন-রাত পাহারা দেবে, দেখবে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। দেখবে, সত্যি খাঁটি কিনা, না আছে কিছু বুজরুকি।

রামকৃষ্ণ খুশি। হ্যাঁ, বাজিয়ে নাও যাচাই করে নাও। শানের উপর মহাজন যেমন শক্ত হাতে টাকা বাজায়, বেপারী যেমন তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নেয় টুটাফুটা।

ব্রাহ্ম ভক্তরা রামকৃষ্ণকে বললো, 'তুমি কেশববাবুকে ধরো, তাহলে তোমার ভালো হবে।'

'কিন্তু আমি যে সাকার মানি। আমি যে মা বলে ডাকি। মাকে যদি নিরাকার করি তবে অমন কোলটুকু পাবো কি করে? কি করে দেখবো তবে মায়ের স্নেহভরা নয়ন?'

সেই কেশবের যখন অসুখ করলো রামকৃষ্ণ মায়ের কাছে ডাব-চিনি মানলো। শেষরাতে ঘুম ভেঙে যায়, আর মার কাছে বসে কাঁদেন রামকৃষ্ণ। বলেন, 'আমার কেশবের অসুখ ভালো করে দাও! কেশব না থাকলে আমি কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কইবো!'

কেশবের বাড়ি এসেছেন রামকৃষ্ণ। সেখানে ধ্যানে হঠাৎ মা-কালীর আবির্ভাব। রামকৃষ্ণ বলছেন, 'মাগো, এখানে তুই আসিস না। এরা তোর রূপ-টুপ মানে না। কেবল নিরাকার করে।'

কিন্তু এমনি আর কতোদিন যাবে।

কলুটোলার বাড়িতে রামকৃষ্ণ যখন প্রথম গিয়েছিলেন, হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে, কেশব তখন টেবিলে কী লিখছিলো, ওঁদের দেখেও দেখলো না। একটা নমস্কার পর্যন্ত করলো না। সহৃদয় রামকৃষ্ণ মেঝের উপর ফরাশে বসলেন। প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ পরে কলম ছেড়ে চেয়ার থেকে নেমে বসলো কেশব।

কেশবকে আসতে দেখেই নমস্কার করলেন ঠাকুর।

আর যায় কোথা! কেশবও নমস্কার করলো। ভূমিষ্ঠ নমস্কার।

গিরীশ ঘোষ বলে, 'রাম অবতারে ধনুর্বাণ নিয়ে জগজ্জয় হয়েছিলো, কৃষ্ণ অবতারে জগজ্জয় হয়েছিলো বংশীধ্বনিতে আর রামকৃষ্ণ অবতারে জগজ্জয় হবে প্রণাম মন্ত্রে!'

নাম আর প্রণাম এই-ই তো পূজার ফুল-জল। সাধন-ভজন।

'দেখো, কেশব কতো পণ্ডিত!' বলছেন ঠাকুর, 'ইংরিজিতে লেকচার দেয়, কতো লোক তাকে মানে। স্বয়ং কুইন ভিক্টোরিয়া তার সঙ্গে বসে কথা কয়েছে। কিন্তু এখানে যখন আসে, শুধু-গায়ে। সাধুদর্শন করতে হলে হাতে কিছু আনতে হয়, তাই ফল হাতে করে আসে। কতোবড়ো ভক্ত। একেবারে অভিমানশূন্য।'

বিদ্যায় কী হবে যদি ভক্তি না থাকে? ভক্তিই পরা বিদ্যা।

'কেশববাবুর পিতামহ রামকমল সেন ভক্ত ছিলেন।' বললো মাষ্টার, 'তুলসীকাননের মধ্যে বসে নাম করতেন। কেশবের বাবা প্যারীমোহনও ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন।'

ঠাকুর বললেন, 'বাপ ওরকম না হলে ছেলে অমন হয় না।'

'কেশবের বৈরাগ্য বাল্যকাল থেকেই।' বললো প্রতাপ, 'বাল্যকাল থেকেই তার আমোদ-আহ্লাদে অরুচি।'

শিষ্যদের সঙ্গে এসেছে দক্ষিণেশ্বর।

ঠাকুর বললেন, 'তোমার লেকচার শুনবো।'

চাঁদনিতে বসে লেকচার দিলো কেশব।

তারপর ঘাটে বসে আলাপ শুরু করলো ঠাকুরের সঙ্গে। ঠাকুর বললেন, 'যিনি ভগবান তিনিই একরূপে ভক্ত। আবার আরেকরূপে ভাগবত। বলো, ভাগবত-ভক্ত-ভগবান—'

কেশব বললো, ভাগবত-ভক্ত-ভগবান। সঙ্গে-সঙ্গে তার শিষ্যরাও বললো সমস্বরে।

'বলো—গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব—' বলে উঠলেন ঠাকুর।

কেশব হাসলো। বললো, 'মশায়, এখুনি এতোদূর নয়। লোকে গোঁড়া বলবে।'

ঠাকুর আবার বললেন, ' 'আমি' ত্যাগ না করলে হবে না।'

'তাহলে মশায়, দলটল থাকে না।' হাসলো কেশব।

'কাঁচা আমি, বজ্জাত আমি ত্যাগ করতে বলছি, কিন্তু পাকা আমি, বালক আমি, দাস আমি, সন্তান আমি ত্যাগ করতে বলছি না।'

'তুমি মা, আমি সন্তান—এর মতো সুন্দর, এর মতো সহজ আর কিছু আছে ?

'তোমরা যাকে ব্রহ্ম বলো তাঁকেই আমি শক্তি বলি, আদ্যাশক্তি বলি! যখন বাক্য-মনের অতীত, নির্গুণ নিষ্ক্রিয় তখন তিনি ব্রহ্ম।' বলছেন ঠাকুর, 'কিন্তু যখন দেখি তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন তখন তিনি শক্তি।'

শক্তিকে মেনেছে কেশব। মেনেছে কালীকে, চিন্ময়ী কালীকে। আগে খোল-করতাল নিয়ে ব্রহ্মনাম করতো, এখন মা নাম ধরেছে। কেশব এখন মা-মা বলে ঈশ্বরের নামকীর্তন করে।

যে দেশে যে রকম মাটি, যে রকম ভাব। কীর্তন-ক্রন্দন না হলে মন সহজে সাড়া দেবে না। আর ঈশ্বরের কাছে আসতে চাওয়া মানেই সরল হয়ে যাওয়া। কেশব সরলতার প্রতিমূর্তি।

'কেশব সেন কী সরল ছিলো!' বলছেন ঠাকুর, 'একদিন কালী-বাড়ি গিয়েছিলো। অতিথিশালা দেখে বেলা চারটের সময় বললো, 'হ্যাঁ গা, অতিথি কাঙালদের কখন খাওয়া হবে?'

সেই কেশবের বাড়াবাড়ি অসুখ।

'তোমার অসুখ হয়েছে কেন তার মানে আছে। শরীরের ভেতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গিয়েছে কিনা তাই।' বললেন ঠাকুর: 'কুঁড়ে ঘরে হাতি ঢুকলে এমনটি হয়। ঘর তোলপাড় করে ভেঙেচুরে দেয়। তেমনি ভাবহস্তী তোমার দেহ বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে।'

কেশবের মা বললো, 'আমার কেশবের অসুখ যাতে সারে তাই করে দিন—'

ঠাকুর বললেন, 'সুবচনী আনন্দময়ীকে ডাকো।'

'আপনি আশীর্বাদ করুন কেশবকে।'

'আমার কী সাধ্য! তিনি আশীর্বাদ করবেন। তোমার কর্ম তুমি করো মা লোকে বলে করি আমি—'

কেশবের অবস্থা ভালো নয় জেনে তার 'কমল কুটিরে' তাকে দেখতে এসেছেন ঠাকুর। কিন্তু সবাই তাকে বসিয়ে রেখেছে বাইরে, কেশবের কাছে যেতে দিচ্ছে না। কেশব এখন বিশ্রাম করছে।

'ওগো আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো।'

'তাঁর অবস্থা এখন অন্য রকম হয়ে গিয়েছে।' প্রসন্ন এসে বললো, 'আপনারাই মতো মার সঙ্গে কথা কন! মা কী বলেন তাই শুনে হাসেন, কাঁদেন—'

বলো কী! এতোদূর! শুধু মাকে মানা নয়, মায়ের সঙ্গে কথা বলা!

ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে ঘরের চারিদিকে তাকালেন। ঘরভর্তি চেয়ার কৌচ আলনা টেবিল। বললেন, 'এখন এসবে আর কী দরকার!' আবার ভাবাবেশ এলো: 'এই যে মা এসেছে! এসো আবার, বেনারসী শাড়ি পরে সেজেগুজে ক। দেখাও। হাঙ্গামা করো না। বসো গো, বসো।'

'তোমার মাকে বলো, আমার কেশব ভালো হোক।'

'অসুখ ভালো হোক, ওসব কথা আমি বলতে পারি না।' বললেন ঠাকুর, 'ও ক্ষমতা আমি মার কাছে চাইও না। মাকে শুধু বলি, মা আমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি দাও!'

এরপর ঠাকুর তখন দক্ষিণেশ্বরে, কেশবের তিরোভাবের কথা জানানো হলো। ঠাকুরের মনে হলো, একটা অঙ্গ যেন গেলো। এমন কম্প এলো যে, লেপ চাপা দিয়ে পড়ে রইলেন, তিনদিন বেহুঁশ।

মাষ্টারকে একদিন বললেন ঠাকুর, 'কেশবের মা এসেছিলো। বাড়ির ছোকরারা হরিনাম করলো। কেশবের মা তাদের প্রদক্ষিণ করে হাততালি দিতে লাগলো। দেখলাম, শোকে কাতর হয়নি। এখানে এসে একাদশী করলো। মালাটি নিয়ে জপ করে। বেশ ভক্তি!'

'ওরে, আমি উলুবনে মুক্তো ছড়াই না!' নব্য বাংলার মাতব্বর ছেলেদের বলছেন ঠাকুর: 'কালে সব বুঝতে পারবি। ওই হে কথায় আছে না—যারে ধ্যানে না পায় মুনি, তাকে ঝাঁটায় নন্দরানী।'

তো শালারা আমাকে লাট করে ফেললি। আমাকে সেই এক বুঝেছিলো কেশব সেন। বলরামকে বলেছিলেন, তোমরা বুঝতে পারছো না, উনি কে। তাই অতো ঘাঁটাঘাঁটি করছো। ওঁকে মখমলে মুড়ে একটি গেলাসকেসের মধ্যে রাখবে, দু'চারটি ফুল দেবে আর দূর থেকে প্রণাম করবে।

'আমরা তো আর কেশব সেন নই যে, তাঁর মতো আপনাকে দেখবো', কে একজন রাগ করে বললো, 'বেশ, না হয় কাল থেকে আর আসবো না।'

ঠাকুর হেসে বললেন, 'বা গো সখি, ঠোঁটের আগায় দেখছি বেশ রাগটুকু আছে।'



বাপ-মা নেই, রাখতুরাম খুড়োর সংসারে মানুষ হচ্ছে। খুড়োও নিঃসন্তান, তাই সমস্ত স্নেহ এই রাখতুরামের উপর।

রাখতুরাম রাখালি করে।

গরু চরায়। গোঠে-মাঠে ঘুরে বেড়ায়। দুপুরে গাছের ছায়ায় বসে কখনো-কখনো গান ধরে—মনুয়া রে, সীতারাম ভজন কর লিজিয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও লাটু



গরীব মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করলো রাখতুরামের খুড়ো। সেই ঋণ বাড়তে-বাড়তে খুড়োর সমস্ত জমি-জমা গ্রাস করলো। রাখতুরামের হাত ধরে খুড়ো পথে এসে দাঁড়ালো।

'চাচাজী!'

'চল, কলকাতা চল। দেখি কাজ-টাজ যোগাড় করতে পারি কিনা সেখানে কিছু।'

কোথায় ছাপরা জেলার এক মেঠো পাড়া গাঁ আর কোথায় ইটের পর ইট কঠিন কলকাতা।

দেশের লোক কাউকে পাওয়া যায় কিনা এখানে-ওখানে খুঁজতে লাগলো চাচাজী। অনেক ঘোরাঘুরি করে পাওয়া গেলো ফুলচাঁদকে। ফুলচাঁদ রাম দত্তের আরদালি। রাম দত্ত মেডিকেল কলেজের রাসায়নিক পরীক্ষক। সিমলে ষ্ট্রীটে থাকে।

ফুলচাঁদ বললো, 'ছেলেটাকে আমার কাছে রেখে যা। দেখি, বাবুকে বলে-কয়ে রাজি করাতে পারি কিনা।'

'আমার রাখতুরাম খুব ভালো ছেলে।' চাচা অনুনয় করলো ফুলচাঁদকে: 'যা করতে বলবে তাই করবে।'

রাম দত্তকে তাই বললো গিয়ে ফুলচাঁদ।

'কোথায় ছেলেটা?'

আশ্চর্য, ছেলেটাকে দেখেই রামদত্তের পছন্দ হয়ে গেলো। চেহারায় কেমন একটা তাজা তেজী ভাব। চোখ দুটো যেমন উজ্জ্বল তেমনি সরলতায় ভরা। সমস্ত শরীরে স্বাস্থ্য যেন শ্রী হয়ে ফুটে আছে।

'কী রে, কাজ করতে পারবি?'

'পারবো।'

কাজ আর কী। বাজার করা, বাড়ির মেয়েদের ফুটফরমাস খাটা আর অফিসে আমার টিফিন নিয়ে যাওয়া। পারবি?'

বললে যেন গন্ধমাদন পর্বত নিয়ে আসতে পারে এমনি ভাব করলো রাখতুরাম : 'খুব পারবো।'

'কিন্তু শোন, তোর অতোবড়ো নাম আমি বলতে পারবো না।' গম্ভীর থেকে একটু তরল হলো রাম দত্ত : 'তোকে আমি ছোট্ট করে লালটু বলবো। কী, রাজি ?'

হেসে ঘাড় নোয়ালো রাখতুরাম। খুব রাজি।

লালটু থেকে আরো ছোটো হলো লাটুতে।

'জানেন, আপনার চাকর আখড়ায় গিয়ে কুস্তি করে ?' পাড়ার লোকেরা রাম দত্তের কাছে এসে নালিশ করলো।

'বাঃ, কুস্তি করা তো ভালো।'

'ভালো ? কুস্তি করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে তো ও একদিন পাড়ায় ডাকাতি করবে।'

'যখন করবে তখন দেখা যাবে।' রাম দত্ত নালিশ উড়িয়ে দিলো।

ডাকাতি না করুক, ছোঁড়াটা জলজ্যান্ত চুরি তো করছে এখন।

'আপনার চাকর লাটু, বাজারের পয়সা চুরি করছে।' পাড়ার লোকেরা জানালো আরেক নালিশ : 'ফর্দ ধরুন। হিসেব মেলান।'

'হ্যাঁ রে, ছোঁড়া,' রামদত্ত হাঁক দিলো : 'বাজার থেকে আজ ক' পয়সা চুরি করেছিস ?'

লাটু দাঁড়ালো স্থির হয়ে। সত্যের তেজ ফুটে উঠলো মুখে-চোখে। বললো, 'জানবেন বাবু, হামি নোকর আছে, চোর না আছে।'

রাম দত্ত তাকালো প্রতিবেশীদের দিকে। প্রতিবেশীরা চলে গেলো।

তখনকার মতো সব মিটে গেলো। কিন্তু তারপর দুপুরবেলা কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে লাটু কাঁদছে।

'কী হলো ? কে কী বললো ? মারধোর করেছে নাকি কেউ।'

'না তো।'

'তবে কাঁদছিস কেন ? চাচাজীর জন্যে মন কেমন করছে ?'

'না, তাও না।'

লাটু তাকালো ফ্যালফ্যাল করে। কেন যে কাঁদছে, কেন যে কান্না পাচ্ছে তা কে বলবে !

রবিবারে রাম দত্ত দক্ষিণেশ্বরে চলেছে, লাটু এসে বললো, 'হামাকে নিয়ে চলুন।'

'সে কী, তুই কোথা যাবি।'

'যার কথা আপুনি বলেন সেই রামকৃষ্ণকে হামি দেখবে।'

এতো যখন আগ্রহ ছেলেটার, কাজেই তখন রাম দত্ত লাটুকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো।

গোলগাল বেঁটেখেটে জোয়ান চেহারার হিন্দুস্থানী চাকর। চাকর বলে ঘরে ঢোকবার সাহস নেই। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো জোড়হাতে।

'ও ছেলেটাকে কোথায় পেলে !' জিগ্যেস করলেন রামকৃষ্ণ, 'ওর যে সাধুর লক্ষণ।'

লাটু আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো। সাধুর লক্ষণ তো কাঁদবার কী হয়েছে ! 'কী রে, কী হলো ? কাঁদছিস কেন ?'

লাটু বললো, 'আমি ইখানকে থাকবো।'

'এখানে থাকবি—তোকে মাইনে দেবে কে ?' ঘরের বাইরে চলে এলেন রামকৃষ্ণ।

হামি মাইনে লেবে না। আপুনার কাজ করবে।'

'আমার কাজ করবি, আমার আবার কী কাজ ! যা, বাড়ি যা।' রামকৃষ্ণ বুঝি একটু কঠিন হলেন : 'তুই এখানে থাকলে আমার রামের সংসার দেখবে কে ? শোন, রাম তোকে আশ্রয় দিয়েছে, তার কাজ যদি না করবি তো নেমকহারামি হবে। খবরদার, নেমকহারাম হবিনে।'

ফিরে গেলো বটে কিন্তু মন পড়ে রইলো দক্ষিণেশ্বরে।

কিন্তু থেকে-থেকে চলে আসে। কখনো বলে-কয়ে রাম দত্তের দেওয়া ফল-মিষ্টি নিয়ে, কখনো খালি হাতে কাউকে না-জানিয়ে। এক রাজ্যের পথ, আসে উধাও-ধাওয়া হাওরার মতোন ছুটতে ছুটতে। আর, এলে শীগগির উঠতে চায় না কাছ ছেড়ে।

রাম দত্তকে ডাকলেন রামকৃষ্ণ। বললেন, 'কী মধু পেয়ে ছোঁড়াটা এখানে পড়ে থাকতে চায় বলো তো? আমি তো কিছু বুঝি না।'

রাম দত্তও বোঝে না।

'তোকে ওখানে খেতে দেবে কে? কাপড়চোপড় দেবে কে? দেশে টাকা পাঠাবি কোত্থেকে?' রাম দত্তের স্ত্রী মুখিয়ে এলো।

'হামার কুছু দরকার নেই।' বললো লাটু, 'হামি বিনা তলবে নোকরি করবে ওইখানে।'

রাম দত্ত তখন ওকে ছেড়ে দিলো। বললো, 'যা, যেখানে তোর মন চায়, তুই সেখানেই থাক।'

রামকৃষ্ণের কাছে এসে লাটু বললো, 'হামাকে লেখা-পড়া শিখিয়ে দিন।'

'ভালো লোকের কাছেই এসেছিস!' রামকৃষ্ণ হাসলেন। বললেন, 'যা, বর্ণপরিচয় নিয়ে আয়।'

লাটু বর্ণপরিচয় নিয়ে এলো।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'বল, ক।'

লাটু বললো, 'কা—'

'ওরে কা নয়, ক। বল্—ক।'

লাটু আবার বললো, 'কা—'

কিছুতেই তার খোট্টাই জিভ সজুত করতে পারছে না। রামকৃষ্ণ যতো বলছেন, 'ক', লাটু ততো বলছে 'কা'।

রামকৃষ্ণ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'শালা, ক-কেই যদি কা বলবি তবে ক-ও আকারকে কী বলবি? যা শালা, তোর আর পড়ে কাজ নেই।'

যাক, ছুটি মিলে গেলো লাটুর। রামকৃষ্ণও হাঁপ ছাড়লেন।

লাটুকে শিবমন্দিরে ধ্যান করতে পাঠিয়েছেন রামকৃষ্ণ। ঢুকেছে সেই দুপুরবেলা, বিকেল হয়ে এলো লাটুর এখনো বেরোবার নাম নেই। ওরে, কী করছে দেখে আয় তো।

রামলাল গেলো খোঁজ নিতে। ফিরে এসে বললো, 'এক গা ঘেমে আছে। নিথর পাথর।'

'একটা পাখা দে', বললেন, 'তুই এক গেলাস জল নিয়ে আয়।'

পাখা নিয়ে শিবমন্দিরে চললেন রামকৃষ্ণ!

জল নিয়ে গিয়ে রামলাল দেখলো রামকৃষ্ণ লাটুকে হাওয়া করছেন। আর তুলো যেমন হাওয়ায় কাঁপে তেমনি লাটুর শরীর কাঁপছে।

'ওরে, বেলা যে আর নেই। সন্ধে-টন্ধে কখন সাজাবি?' লাটুর উদ্দেশে স্নিগ্ধস্বরে জিগ্যেস করলেন রামকৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর শুনে লাটুর ধ্যান ভাঙলো। এ কী, যেন এতোক্ষণ ধ্যানে ছিলেন, তিনিই এখন বসেছেন পাশটিতে। মার মতোন বাতাস করছেন সস্নেহে।

লাটু ব্যস্ত হয়ে উঠতে চাইলো আসন ছেড়ে।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'আগে একটু সুস্থ হ, তারপরে উঠিস। দেখছিস না, গরমে কেমন ঘেমে গেছিস?'

'কিন্তু আপুনি এ কী করছেন?' পাখার দিকে লক্ষ্য করলো লাটু। 'এতে হামার অকল্যাণ হবে।'

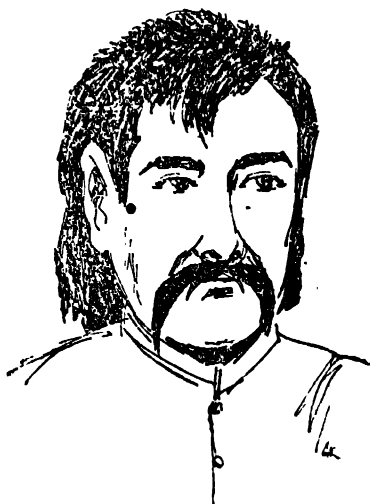
রামকৃষ্ণ হাসলেন। বললেন, 'তোর কে সেবা করছে? তোর মধ্যে যে শিব এসেছিলেন তাঁর সেবা করছিলাম। গরমে যে তাঁর কষ্ট হচ্ছিলো। নে, এখন এই এক গেলাস জল খা দিকিনি—'

এই চাকর লাটুই শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ।



মহেন্দ্র সরকার বিরাট ডাক্তার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-ডি। বিজ্ঞানের দিকপাল। সবাই চেনে একবাক্যে। ডাক্তার সরকার না ধন্বন্তরি! সেই লোক কিনা হঠাৎ আবার হোমিওপ্যাথি শুরু করলো। এ কী পাগলামি! না, তা নয়। তা হবে কেন। এ পাগলামি নয়, এ হচ্ছে সত্যসন্ধান। দেখবো এর মধ্যে সত্য আছে কি নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ডাক্তার সরকার



আর যদি একবার বুঝি, যে সত্যই সত্য আছে, তাহলে ফিরবো না।'

মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভা হচ্ছে। ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার বক্তৃতা দিচ্ছেন। বক্তৃতার বিষয় কী? বক্তৃতার বিষয় হোমিওপ্যাথি। হ্যানিম্যানের গুণকীর্তন। সহকর্মী অ্যালোপ্যাথের দল তীব্র আপত্তি করলো। ওসব বাজে অবৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া চলবে না।

'বিষয় যে অবৈজ্ঞানিক নয় তাই তো প্রমাণ করবো।' ডাক্তার সরকারও দৃঢ়সঙ্কল্প।

'চুপ করো।' গর্জে উঠলো অ্যালোপাথের দল।

'বক্তব্য শুনবে না, এ কোন্ ধরনের বিজ্ঞান?' ডাক্তার সরকার বিদ্রূপ করে উঠলেন।

'মুখ চেপে ধরো। ঘাড় ধরে বার করে দাও।'

ডাক্তার সরকার শান্ত স্বরে বললেন, 'গায়ের জোর বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞান সত্যের জোর। ঘাড় ধরে আমাকে বার করে দিলেও আমার সত্যকে হটানো যাবে না। আমি আমার সত্যকে প্রকাশ করে যাবো। যা বুঝেছি, যা জেনেছি—তা বলতে পেছপা হবো না। শুধু বলে যাবো না, করে যাবো। দেখিয়ে যাবো। অর্থাৎ নিজেও প্রকাশিত হবো।

কিন্তু এ কোন্ প্রকাশিত সত্য? এই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস?

গলায় ক্যান্সার হয়েছে, ডাক্তার সরকারের চিকিৎসাধীনে আছেন। গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজের চিকিৎসায় কোনো ফল হয়নি, ইংরেজ ডাক্তাররাও মাথা নেড়ে ফিরে গিয়েছেন। রোগ অসাধ্য, তাতে সন্দেহ কী। কিন্তু রুগীটি ভারী মধুর।

গলায় সহনাতীত যন্ত্রণা, তবু সারাক্ষণ কথা কইছেন। কথার সেরা কথা—ঈশ্বরকথা। আর আশ্চর্য, তাই কিনা ঘণ্টার পর ঘণ্টা একমনে বসে শুনছে ডাক্তার! শুনতে ভালো লাগছে?

একেক সময় এমনও মনে হচ্ছে তিনি নিজেই বুঝি রুগী আর যাঁর অসুখ তিনি ভালো করতে এসেছেন তিনিই ডাক্তার!

কি মধুময় কথা!

ভক্তিলাভের পর সংসার করা যায়। যেমন হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে আঠা লাগে না। সংসার জল, আর মানুষের মনটি যেন দুধ। জলে যদি দুধ রাখতে যাও, দুধে জলে এক হয়ে যাবে। তাই নির্জন স্থানে দই পাততে হয়। দই পেতে মাখন তুলতে হয়। মাখন তুলে যদি জলে রাখো, তাহলে জলে মিশবে না, নির্লিপ্ত হয়ে ভাসতে থাকবে।

গিরিশ ঘোষ ধমকে উঠলো 'আপনি যে এখানে তিন-চার ঘণ্টা ধরে রয়েছেন এ কেমন কথা? আর রুগী নেই আপনার? তাদের চিকিৎসা করতে হবে না?'

'আর ডাক্তারি আর রুগী!' ডাক্তার সরকার গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন: 'যে পরমহংস হয়েছে তার জন্যে আমার সব গেলো।'

মাষ্টারমশাইকে বলছে, 'তোমরা জানো না আমার কী ভীষণ লোকসান হচ্ছে! রোজ রোজ দু-তিনটে কল মারা যাচ্ছে। পরদিন নিজেই রুগীদের বাড়ি যাই, ফি নিই না। নিজের থেকে গেলে ফি নেবো কেমন করে?

'ডাক্তারের বাড়ি গিয়েছিলে?' রামকৃষ্ণ মাষ্টারমশাইকে জিগ্যেস করলেন।

'গিয়েছিলাম।'

'অসুখের কথা কী বললো?'

'তাই জানতেই তো গিয়েছিলাম। জিগ্যেস করলাম, আজ ব্যারামের কী ব্যবস্থা হবে? ডাক্তার বললো, ব্যবস্থা আমার মাথা আর মুণ্ডু। আমাকে আবার যেতে হবে—শুধু এই ব্যবস্থা!'

রোজ লোকসান হচ্ছে তবু ডাক্তারের যাওয়া চাই।

তবে কি ডাক্তারের ঈশ্বরে বিশ্বাস হচ্ছে? বৈজ্ঞানিক, যুক্তিবাদী, বাস্তবপন্থী ডাক্তার—তার কিনা আজগুবিতে বিশ্বাস! যাকে দেখা যায় না, ধরা যায় না, জানা যায় না, সে থাকে কী করে?

না না, ঈশ্বর বলি না, বিজ্ঞান বলি, বিজ্ঞানই বলি। কিন্তু যতোদূর

আমার বুদ্ধি ততোদূরই তো বিজ্ঞান। আমার বুদ্ধির বাইরে কি কিছু নেই? তবে বিজ্ঞান সেখানে কোথায়? কারণের পর কারণ খুঁজে বেড়াচ্ছি কিন্তু সমস্ত কারণের কর্তা কে, এ কে বলবে?

শিবনাথের বন্ধুর স্ত্রীর খুব অসুখ। অবস্থা এমন নয় যে, ভালো ডাক্তার দেখায়। শিবনাথ বিদ্যাসাগরকে ধরলো। বিদ্যাসাগর ধরলো ডাক্তার সরকারকে—যদি বিনা ফিতে গরিবকে দেখে।

ডাক্তার সরকার তখনি দেখতে ছুটলেন। বারে বারে ছুটলেন। কিন্তু শত চেষ্টায়ও বাউটিকে সুস্থ করতে পারলেন না।

বউটি মারা যাবার একদিন আগে, রাত প্রায় দশটা, শিবনাথ হন্তদন্ত হয়ে এসেছে ডাক্তারের কাছে: 'শীগগির নতুন একটা কিছু ওষুধ চাই, বড্ড ছটফট করছে।'

'দিচ্ছি। কিন্তু অষুধের জন্যে শিশি এনেছো?' ডাক্তার সরকার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু আশ্চর্য, শিবনাথ শিশি আনতে ভুলে গিয়েছে। কোনোদিন তার এমন ভুল হয় না, আজ এই সঙ্গিন মুহূর্তেই এমন বিস্মরণ!

ডাক্তার নিজের বাড়িতে খোঁজ করলেন। কিন্তু যেমনটি দরকার পাওয়া গেলো না। শিবনাথ ছুটে বেরিয়ে গেলো। কোনো ডাক্তারখানা থেকে যদি কিনতে পারে। রাত অনেক হলো। তা হোক। শিশি একটা যোগাড় হবে না?

শিবনাথ যখন শিশি নিয়ে ফিরলো তখন অমেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ডাক্তার ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'এরি জন্যে মনে হচ্ছে বউটি বাঁচবার নয়। যদি বাঁচবার হতো, তোমার শিশি আনতে ভুল হবে কেন, আর আমার ঘরেই বা একটা শিশিও পাওয়া যায় না কেন?'

'বাঃ, এই তো এনেছি, যোগাড় করে।'

'যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত দামী সেখানে এতোটা সময় অনর্থক নষ্টই বা হয় কেন? কোন্ ওজরে? শিবনাথ, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বাঁচাতে পারলাম না।'

শিবনাথ ম্লান হয়ে গেলো। বললো, 'আপনিও যদি এই কথা বলেন, আমরা যাই কোথায়?'

ডাক্তার চমকে উঠলেন: 'কেন, কী বললাম আমি?'

'আপনি ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক।' শিবনাথ ঋজু কণ্ঠে বললো, 'আপনিও যদি ভাগ্য বা নিয়তির ওপর নির্ভর করে থাকেন তাহলে আমাদের উপায় কী?'

'অনেকদিন ধরে ডাক্তারি করছি, হাড়ে ঘুণ ধরে গেলো। কিন্তু সর্বদা এই সত্যই উপলব্ধি করছি, আরেকটা শক্তি সমস্ত প্রাণী-জীবনকে চালনা করছে। যতোই ওষুধ দিই, ছুরি-কাঁচি চালাই, আমরা কিছু নয়, অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছি মাত্র। যার মৃত্যু নিশ্চিত, কোন্ ডাক্তার তাকে রক্ষা করে।'

'তাহলে ডাক্তারি ছেড়ে দিন।' শিবনাথ ঝলসে উঠলো: 'সবাইকে বলুন, ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করে চুপচাপ বসে থাকো।'

'তা কেন?' ডাক্তার শান্তমুখে বললেন, 'অন্ধকারে আছি বলেই তো বেশী করে হাতড়াতে হবে, বেশী করে আঁকড়াতে হবে। ফলাফল আমাদের হাতে না থাক, তবু আমরা বীর, আমরা লড়াই করে যাবো। সত্য খুঁজতে খুঁজতে ধরে ফেলবো সেই সত্যস্বরূপকে।'

কিন্তু এ নতুন রুগী, রামকৃষ্ণ কী বলেন? বলেন, 'ডাক্তার, আমার এই অসুখটা ভালো করে দাও। তাঁর নাম গুণগান করতে পাই না।'

শোনো, কী অদ্ভুত কথা। আমাকে ভালো করে দাও—যেন ঈশ্বর-কথা বলতে পারি। যদি একটা দিনেরও আয়ু পাই, তবে সেদিনেও শুধু ঈশ্বরকথা কইবো।

'যতোক্ষণ আমি আমি করছো ততোক্ষণ যন্ত্রণা,' বলছেন রামকৃষ্ণ, 'যেই তুমি তুমি করলে, সমস্ত যন্ত্রণা সঙ্গীত হয়ে যাবে। এই দেখো না,

গরু যতোক্ষণ হাম্বা হাম্বা বা হাম-হাম করে ততোক্ষণ তার দুঃখ। গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই, সমস্তদিন তাকে লাঙল দিতে হয়। পিটুনি সইতে হয় রাখালের হাতে। তারপর তাকে কসাইরা কাটে। চামারে চামড়া নিয়ে জুতো তৈরী করে। অবশেষে নাড়িভুঁড়ি থেকে তাঁত হয়। ধুনুরির হাতে পড়ে যখন সে তাঁত তুহুঁ তুহুঁ—তুমি তুমি করে তখনই নিস্তার। অর্থাৎ যখন মানুষ বলে আমি নই, আমি কেউ নই, হে ঈশ্বর তুমিই কর্তা তুমিই সমস্ত তখনই তার যন্ত্রণার অবসান।'

ডাক্তার বললেন, 'কিন্তু ধুনুরির হাতে পড়া চাই।'

আশ্চর্য, ডাক্তারও তবে ধুনুরির হাতে ধরা পড়বার কথা ভাবে!

বর্ষার রাত, তিনটের সময় ঘুম ভেঙে গিয়েছে ডাক্তারের! ভাবনা ধরেছে, রামকৃষ্ণের ঘরের জানলা বন্ধ আছে কিনা। নাকি খোলা জানলায় নতুন করে ঠাণ্ডা লাগলো?

ভোর হতেই খোঁজ নিতে চলে এসেছেন ডাক্তার।

নরেনও এসেছে। রামকৃষ্ণ বললেন ডাক্তারকে, 'গান শুনবেন?'

'না। সেটা তোমার পক্ষে ভালো নয়। তবে যদি ভাব চেপে--'

'না না, আমার আবার ভাব কী!

নরেন গান ধরলো। কিছুক্ষণ শুনেই ঠাকুর অতল ভাব-সমাধিতে ডুবে গেলেন। শরীর নিস্পন্দ, নাকে নিঃশ্বাস নেই, চোখ পাথরের মতো স্থির, নিষ্পলক। যেন একটা জড় কাঠের পুতুল। একবারে বাহ্যশূন্য।

ডাক্তার ঠাকুরের বুকে ষ্টেথিস্কোপ রাখলেন। হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ। নিশ্চল। ষ্টেথিস্কোপ ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ডাক্তার।

নরেনের গান চললো: 'এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ!'

সত্যি, এ যেন কোনো মানুষেরই মুখ নয়। ঈশ্বরেরই মুখ।

ষ্টেথিস্কোপ গুটিয়ে নিলেন ডাক্তার। মনে স্থির জানলেন ঈশ্বরই মহত্তম বিজ্ঞান।



চলেছে পায়ে হেঁটে। চলেছে তো চলেইছে! কতোদূর থেকে আসছে না-জানি। সমস্ত শরীরে ধুলো। 'দক্ষিণেশ্বর কোথায় বলতে পারেন?' শেষে একজনকে জিগ্যেস করলো।

'সে কি মশাই? দক্ষিণেশ্বর যে আপনি ছাড়িয়ে এসেছেন।'

দুপুর দুটোর সময় মন্দিরে এসে পৌঁছোলো দুর্গাচরণ। সে যখন আট

শ্রীরামকৃষ্ণ ও দুর্গাচরণ নাগ



বছরের ছেলে তখন মা মারা যায়। পিসীমা মানুষ করে। রাতে যখন পিসীমা রূপকথার গল্প বলতো তখন জানলা দিয়ে তারা-জ্বলা আকাশের দিকে তাকিয়ে দুর্গাচরণ বলতো আমি ওই দেশে যাবো পিসীমা, আমাকে ওখানে নিয়ে চলো।

যদিও তখন ভর-দুপুর, দুর্গাচরণের মনে হলো, এটাই বুঝি তারা-জ্বলা আকাশের ওপারে সেই রূপকথার রাজ্য !

'হ্যাঁ মশাই, এখানে একজন সাধু থাকেন ?' একজন দাড়িওয়ালা লোককে জিগ্যেস করলো দুর্গাচরণ।

দাড়িওয়ালা লোক আর কেউ নয়, প্রতাপ হাজরা। তার শুধু পাটোয়ারী বুদ্ধি।

বললো, 'হ্যাঁ, একজন আছেন বটে, কিন্তু আজ তো এখানে নেই।'

'নেই ?' বসে পড়লো দুর্গাচরণ : 'কোথায় গিয়েছেন ?'

'চন্দননগরে। কবে ফিরবেন ঠিক নেই। তুমি আরেকদিন এসো।'

অবসন্ন পায়ে হৃতসর্বস্বের মতো আবার কলকাতা ফিরে চলা ! তারা-জ্বলা আকাশ বুঝি এক ফুঁয়ে অন্ধকার হয়ে গেলো।

ও মা, ওই দেখো ঘরের ভিতর থেকে হাতছানি দিয়ে কে ডাকছে ! আর কে ! ওই বুঝি তার মনের মানুষ !

প্রতাপ হাজরাকে উপেক্ষা করে সটান ঘরে ঢুকে পড়লো দুর্গাচরণ। দেখলো, ছোটো তক্তপোশটির উপর পা ছড়িয়ে বসে আছেন রামকৃষ্ণ।

প্রতাপ হাজরা লোককে বেশী ঘেঁষতে দিতে চায় না। পাছে আর কেউ তার বরাদ্দে ভাগ বসায়। কিন্তু ঠাকুর যাকে ডাকেন তাকে আটকায় প্রতাপের সাধ্য কী !

দুর্গাচরণ ঠাকুরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেলো।

রামকৃষ্ণ পা সরিয়ে নিলেন।

'তুমি তো ডাক্তার।'

হ্যাঁ, ক্যাম্বেলে ক'দিন পড়েছিলো দুর্গাচরণ। কলেজ ছেড়ে দিয়ে হোমিওপ্যাথি করছে। বিস্তর নাম ডাক।

'ডাক্তারের ধর্মলাভ হওয়া কঠিন।' বললেন রামকৃষ্ণ, 'এক ফোঁটা ওষুধেই যদি মন পড়ে থাকে, তাহলে কী করে এই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণা হবে!'

দরকার নেই আমার ধর্মলাভে। দুর্গাচরণ মনে মনে বললো। যে তোমার চরণস্পর্শ লাভ করতে পারলো না কী হবে তার বিরাটের ধারণা নিয়ে!

'শোনো, তুমি সংসারেই থাকবে, গৃহই তোমার পীঠস্থান। কিন্তু কী রকম থাকবে বলো তো?' রামকৃষ্ণ স্মিতমুখে বললেন, 'থাকবে পাঁকাল মাছের মতো। পাঁকাল মাছ পাঁকের মধ্যে ডুবে আছে কিন্তু গায়ে পাঁকের স্পর্শলেশ নেই। তেমনি সংসারে থাকো কিন্তু তার ময়লা যেন না লাগে।'

তোমার পায়ের স্পর্শটুকুই পেলাম না, কী করে আমার ময়লা কাটবে? অন্তরের নির্জনে বসে নীরবে কাঁদতে লাগলো দুর্গাচরণ।

'আচ্ছা, তুমি তো ডাক্তার, তবে দেখো তো আমার পায়ে কী হয়েছে!' রামকৃষ্ণ পা দু'খানি বাড়িয়ে ধরলেন।

কাছে সরে এলো দুর্গাচরণ। স্পর্শ করা বারণ, তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। কুণ্ঠিতের মতো বললো, 'কই, কোথাও তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না!'

রামকৃষ্ণ হাসলেন: 'আহা, ভালো করে দেখো না, কী হয়েছে?'

এতোক্ষণে তবে বুঝলো দুর্গাচরণ। পা দু'খানি চেপে ধরলো মাথা লুটিয়ে দিলো পায়ে। অন্তর্যামী মনের কান্না শুনতে পেয়েছেন। অহঙ্কার অশ্রুতে দ্রবীভূত হলেই পরমপদ লাভের যোগ্যতা আসে।

দুর্গাচরণ ওষুধের বাক্স আর চিকিৎসা-প্রণালী বই ফেলে দিলো গঙ্গায়।

কী করে চলবে তবে?

ভগবান চালাবেন। তাঁর রাজ্যে কিছুই অচল নেই।

বাড়ির লাউগাছটার কাছে গরু বাঁধা। দড়িটা ছোটো, তাই আকণ্ঠ চেষ্টা করেও গাছের নাগাল পাচ্ছে না। গরুটার ক্ষুধার্ত দুই চোখে লোলুপ কাতরতা। ও মা, খাবি, খেতে সাধ গিয়েছে? নে খা, মনের সাধ মিটিয়ে খা। দড়িটা খুলে দিলো দুর্গাচরণ। মুহূর্তে গাছটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো।

জেলে মাছ বেচতে এসেছে, কই মাগুর সিঙ্গি। কাছেই এই পুকুরের মাছ মশাই, জ্যান্ত, দেখুন লাফাচ্ছে চুপড়িতে। আনন্দে লাফাচ্ছে, না, যন্ত্রণায় ছটফট করছে? সমস্ত মাছ কিনলো দুর্গাচরণ। মুহূর্তমাত্র দেরা না করে মাছগুলি পুকুরে ছেড়ে দিয়ে এলো। জেলে তো থ! দাম আর চুপড়ি যেই ফিরে পেলো অমনি ছুট দিলো ঊর্ধ্বশ্বাসে।

একটা গোখরো সাপ বেরিয়েছে উঠোনে। মারো—মারো, সবাই ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে উঠলো। শুধু দুর্গাচরণ নির্বিচল। বললো, বনের সাপে খায় না, মনের সাপে খায়। যদি ওর অনিষ্ট ইচ্ছা না করো, ও-ও করবে না কিছু অনিষ্ট। যেমন দেবে তেমনি পাবে।'

নাগরাজ! নাগরাজ! সাপকে ডাকতে লাগলো দুর্গাচরণ।

'আসুন আমার সঙ্গে। জঙ্গলে থাকেন, কেন এই ক্ষুদ্র মানুষের ঘরে পদার্পণ করেছেন? এখানে আপনার মর্যাদা কে বোঝে?'

ঠাকুর গৃহে থাকতে বলেছেন, কী মনোরম গৃহই দিয়েছেন! চারখানা ঘর, তার মধ্যে তিনখানারই ছাদ ফুটো। অঢেল বর্ষা নেমেছে, যে ঘরখানা নিটুট সে ঘরেই সস্ত্রীক থাকে দুর্গাচরণ। হঠাৎ দু'জন অতিথি এসে উপস্থিত। খাওয়ানো না হয় হলো কিন্তু রাত্রে শুতে দিই কোথায়?

স্ত্রী একবার তাকালো স্বামীর দিকে।

দুর্গাচরণ বললো, 'যে ঘরখানা আমাদের তাই ওদেরকে ছেড়ে দেবো। আজ তো আমাদের মহাভাগ্য। অতিথি-নারায়ণের সেবায় আমাদের ঘুম আর আরাম উৎসর্গ করতে পারছি।'

পেটে শূলব্যথা উঠেছে, ঘরে পড়ে আছে দুর্গাচরণ, আট-দশজন অতিথি এসে হাজির। বাজারে বেরোতে হয়, নইলে অতিথি-সৎকার হয় কি করে ? এদিকে ব্যথার যে কমতি নেই। ব্যথা নিয়েই বেরিয়ে পড়লো দুর্গাচরণ।

আট-দশজনের বাজার, প্রকাণ্ড বোঝা হয়ে দাঁড়ালো। একটা মুটে ডাকলেই তো হয়। সর্বনাশ ? নিজের বোঝা অন্যকে দিয়ে বয়াবো ? কখনো না। মুটে না ডেকে নিজেই সে মোট মাথায় তুললো দুর্গাচরণ! কিন্তু কতোদূর যাবে ? পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। ঠাকুরকে উদ্দেশ করে বললো, 'খুব তো সংসারাশ্রম করতে বলেছো। অতিথি-নারায়ণের সেবা করতে দিচ্ছো কই ?'

ব্যথার উপশম হলে মোট মাথায় নিয়ে ফের চলতে লাগলো দুর্গাচরণ। বাড়ি পৌঁছে তার আবার কান্না : 'আপনাদের কাছে আমি অপরাধী হয়ে রইলাম। আপনাদের সেবার কতো দেরী হয়ে গেলো।'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'যে সংসারে থেকে ঈশ্বরকে ডাকে, ঈশ্বরের সেবা করে, সেই বীরভক্ত। যে সংসার ত্যাগ করেছে সে ঈশ্বরকে ডাকবে, ঈশ্বরের জন্যে করবে তাতে বাহাদুরি কী! যে সংসারে থেকে ঈশ্বরকে ডাকে ঈশ্বরকে ধরে সেই বাহাদুর সেই বীরপুরুষ।'

দুর্গাচরণ সেই বীর।

পাটের কলের দুটো সাহেব গ্রামে পাখি মারতে এসেছে। দুর্গাচরণ ছুটে গিয়ে তাদের বললো, 'পাখি আপনাদের কী করেছে ? ওদের মারবেন না বলছি।'

রুক্ষসূক্ষ্ম পাগলের মতো দেখতে। এর কথা কে গ্রাহ্য করে! একটা সাহেব পাখির দিকে তাক করলো বন্দুক।

খপ করে বন্দুক ধরে ফেললো দুর্গাচরণ। কী স্পর্ধা, সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো বন্দুকের গুলী পাখিকে নয়, তোমাকেই বিদ্ধ করবে, দেখো। কিন্তু সাধ্য কি, দুর্গাচরণের মুঠোর থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নেয়। রোগা লিকলিকে শরীরে এখন শত সিংহের শক্তি। ধস্তাধস্তিতে সাহেব

তাকে কিছুতেই টলাতে পারছে না। দ্বিতীয় সাহেবটা এলো প্রথমের সাহায্যে। তবুও নয়। দুর্গাচরণ বন্দুক কেড়ে নিয়ে চললো বাড়ির দিকে। বাড়ি এসে জলে হাত ধুয়ে ফেললো। কী ভাষণ প্রাণঘাতী অস্ত্র স্পর্শ করেছি !

নিজের উপরেও তার নিষ্ঠুরতা কম নয়।

জিহ্বার সুখেচ্ছা হবে বলে নিজে মিষ্টি বা নুন খায় না। দুর্গাচরণ কিন্তু পরকে খাওয়ায় সাধ্যমতো। তার বাসার অর্ধেকটায় এক চালের আড়তদার থাকে। তার আড়তে কুঁড়ো জমে থাকে। তাই দুর্গাচরণ কুড়িয়ে নিয়ে এসে গঙ্গাজল মাখিয়ে খায়। শুধু আহার আর আস্বাদ নিয়েই যদি থাকবো, তবে কখন ডাকবো ভগবানকে ? কুঁড়ো খেয়ে দিব্যি হাল্‌কা আছি।

আর যাই করো পরনিন্দা করো না। শুনোও না পরনিন্দা। আর গুরুনিন্দা শোনা তো মহাপাতক।

অসতর্কে কাউকে হঠাৎ নিন্দা করে ফেলেছে, অমনি আত্মপীড়ন শুরু হয়ে গেলো। আর নিন্দে করবি ? রাস্তা থেকে একটা পাথর কুড়িয়ে এনে ঘা মারতে লাগলো কপালে। বল, আর অবাধ্য হবি ? কপাল ফেটে রক্ত ঝরতে লাগসো। সে যেমন পাজী তার তেমনি শাস্তি হওয়া দরকার।

কে একজন রামকৃষ্ণের নিন্দে শুরু করেছে।

'থামুন বলছি, ও-সব মিথ্যে কথা।' দুর্গাচরণ প্রমথটা তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করলো।

নিন্দুকের রসনা আরো লেলিহান হয়ে উঠলো।

'এ বাড়িতে বসে ঐসব নিন্দাবাদ করতে পারবেন না বলছি।' দুর্গাচরণ হুমকে উঠলো : 'এই কানে শুনতে পারবো না গুরুনিন্দা।'

গালাগালেরও একটা নেশা আছে। নিন্দুক তাই নিরস্ত হলো না।

'বেরোও, বেরোও তুমি এখান থেকে। নইলে মহা বিভ্রাট হবে বলে দিচ্ছি।'

কে কার কথা শোনে। লোকটার মাথায় ভূত চেপেছে। নিন্দার গলা সে আরো উঁচু করলো।

'তবে রে—' নিজের পায়ে তো জুতো নেই, ওই লোকটারই পায়ের জুতো কেড়ে নিয়ে লোকটাকে পিটতে লাগলো দুর্গাচরণ। 'বেরোও, বেরোও আমার সুমুখ থেকে।'

চলে যেতে যেতে লোকটা শাসিয়ে গেলো, 'আচ্ছা, দেখে নেবো তুমি কেমনতরো সাধু। পাবে এর প্রতিফল।'

দুর্গাচরণ ঘন ঘন ঠাকুরেয় উদ্দেশে প্রণাম করতে লাগলো। ঠাকুর, কেন, কেন তুমি আমাকে গৃহস্থ হতে বললে? সন্ন্যাসী হলে তো আমি নিষ্ক্রিয় ও নির্বিচল হতে পারতাম। গৃহস্থ হওয়ার জন্যই তো আমার এই যন্ত্রণা। প্রতিবেশীর নিন্দা শুনতে হয়, করতে হয় ক্রুদ্ধ প্রতিকার। তারপর আবার প্রতীক্ষা করতে হয় দোর্দণ্ড প্রতিফলের।

মুহূর্তে কী ভোজবাজি হয়ে গেলো কে জানে, লোকটা দেখি একাই ফিরে আসছে। লাঠিসোটা নিয়ে নয়, দু'টি হাত জোড় করে। দুর্গা-চরণের কাছে বসে দীনবচনে বললো, 'আমাকে ক্ষমা করুন।'

জয় শ্রীরামকৃষ্ণ! আনন্দে দুর্গাচরণ লাফিয়ে উঠলো।

'আরে—বসুন বসুন, উঠছেন কেন? এতোবড়ো একজন গণ্যমান্য লোক আপনি অমনি কি ফিরে যেতে আছে? তামাক খেয়ে যান।' দুর্গাচরণ তামাক সাজতে বসলো।

ঠাকুরের কাছে গিয়ে বললো, 'আমাকে তোমার সেবার কাজে লাগাও।'

রামকৃষ্ণ তাকে নানা ফরমাশ খাটাতে লাগলেন। ওরে, হাওয়া কর, পা টিপে দে, তামাক সাজ, গামছা আর বটুয়া নিয়ে আয়, গাড়ুতে জল ভর, নিয়ে চল ঝাউতলায়।

দুর্গাচরণ এক পায়ে খাড়া।

আমাকে আরও বড়ো কাজে লাগাও। একটা কঠিন কিছু করি।

রামকৃষ্ণের তখন অসুখ, তারই শয্যায় দুর্গাচরণ তাঁর গা ঘেঁষে বসেছে। মতলব, ঠাকুরের ব্যাধি নিজের শরীরে আকর্ষণ করে নেবে।

ঠাকুর জানেন, সে ক্ষমতা আছে দুর্গাচরণের! তাই তাকে তিনি বারেবারে নানা কাজের ছুতোয় দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। অসুখ ভালো করবার জন্য যিনি কালীর কাছে, তাঁর মার কাছে পর্যন্ত প্রার্থনা করতে চান না, তিনি সেই ব্যাধি ভক্তদেহে সঞ্চারিত করবেন, এ অসম্ভব।

তবু দুর্গাচরণের আপ্রাণ চেষ্টা।

দেওয়া কাজ পলকে শেষ করে আবার ঠাকুরের গা ঘেঁষে বসেছে। সান্নিধ্যে ঘণতর হচ্ছে।

রামকৃষ্ণ তখন বললেন, 'দুর্গাচরণ, আমার জন্যে আমলকী আনতে পারো—টাটকা আমলকী?'

সেটা শ্রাবণ মাস, আমলকীর সময় নয়। কিন্তু ঠাকুর যখন চেয়েছেন তখন সন্দেহ কী, অকাল ফলোদয় হবে। দুর্গাচরণ বেরিয়ে পড়লো আমলকীর খোঁজে। বিশল্যকরণীর খোঁজে। বিশল্যকরণীর খোঁজে মহাবলী মহাবীর।

স্নান নেই, আহার নেই, নিদ্রা নেই, বিশ্রাম নেই; তিনদিন পরে, কোত্থেকে কে জানে, আমলকী নিয়ে এলো দুর্গাচরণ।

আমলকী পেয়ে ঠাকুরের সে কী আনন্দ!

ঈশ্বরের কৃপাশক্তিতেই জীবনে ফলবে এ আমলকী। ঘটবে অকাল ফলোদয়।

তাই ঈশ্বরকে ধরে থাকো। নিরন্তর ঈশ্বরকথা বলো। আর সব কথার ইতি আছে। ঈশ্বরকথার ইতি নেই।





নদীতীরে বসে এক সাধু সাধন করছে। হঠাৎ চোখ পড়ল জলের দিকে। দেখলো একটা বৃশ্চিক জলে পড়েছে। পারে আসবার জন্য চেষ্টা করছে, কিন্তু স্রোত ঠেলে এগুতে পারছে না। আশ্রয়চ্যুত অসহায়ের মতো হাবুডুবু খাচ্ছে। স্থলের জীব পড়েছে জলের অগাধে। সাধুর মায়া হলো। ভাবলো, আহা, ওকে বাঁচাই, আশ্রয় দিই ওকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ



হাতে করে জল থেকে তুললো তাকে! তোলা মাত্রই বৃশ্চিক তাকে দংশন করলো। বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলো না।

চক্ষের নিমিষে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সাধু বিছেটাকে ছুঁড়ে দিলো জলে। কি অকৃতজ্ঞ! দয়াপরবশ হয়ে আশ্রয় দেবার জন্য তুললাম জল থেকে, আর আমাকেই কিনা কামড়ালো! দীনমনা আর কাকে বলে!

আবার দৃষ্টি পড়লো জলের দিকে। দেখলো, জল থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য বৃশ্চিক প্রাণপণে চেষ্টা করছে। কিন্তু তরঙ্গসঙ্কুল নদীর সঙ্গে পেরে ওঠে তার সাধ্য কি।

সাধুর আবার দয়া হলো। আবার হাত বাড়িয়ে তুললো বিছেটাকে।

ক্রূরাত্মা বৃশ্চিক আবার দংশন করলো সাধুকে। অসহ্য! যেন একটা তপ্ত লোহার শলা হাতের মধ্যে কে গুঁজে দিলো। চক্ষের পলকে বিছেকে আবার জলের মধ্যে ছুঁড়ে দিলো সাধু। বিছের আবার জলে পড়ে প্রাণসংশয় হলো।

তখন সাধু ভাবলো, এ আমি কি করছি? বৃশ্চিক আমার চেয়ে বড়ো সাধু। সে-ই স্থিরব্রত, স্বধর্মনিষ্ঠ। সে বারে বারে তার ধর্ম পালন করছে। উপকারীর করতলকেও সে রেহাই দিচ্ছে না। আর আমি কি করছি? আমি বারে বারে আমার স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হচ্ছি। আমি সাধু, সর্বজীবে দয়া করাই আমার সাধুতা। উপকৃতই হই বা অপকৃতই হই—সর্বাবস্থায় দয়াতে প্রতিষ্ঠিত থাকাই আমার কর্তব্য। কেন আমি বৃশ্চিককে বারে বারে জলে ছুঁড়ে দিচ্ছি? আগুন কি তার উত্তাপ বা ঔজ্জ্বল্য ত্যাগ করে? জল কি ত্যাগ করে শৈত্য বা তারল্য? আমি যদি দয়া বিসর্জন দিই তবে আমি কিসের সাধু?

জল থেকে সাধু আবার তুললো বৃশ্চিককে। যেমন-কে-তেমন বৃশ্চিক আবার দংশন করলো। এবার আর সাধু তাকে ফেললো না ছুঁড়ে। যন্ত্রণায় হাত ছিন্ন হয়ে গেলেও নির্বিচল রইলো। ধীরে ধীরে তাকে নামিয়ে দিল মাটিতে। নিরাশ্রয়কে দিলো তার নিরাপদ বসতি। বিপদ-বদ্ধকে অবাধগমন।

দেবরাজ ইন্দ্র কর্ণের সহজাত কবচকুণ্ডল হরণ করবেন ঠিক করেছেন। হরণ করতে কি আর পারবেন? তাই ভেবেছেন ভিক্ষা চেয়ে নেবেন।

পাণ্ডবদের প্রিয়সাধন করতে তৎপর হয়েছেন ইন্দ্র। অর্জুন যে তাঁর প্রিয়তম।

ইন্দ্রের সঙ্কল্প জানতে পেরেছেন সূর্যদেব। ইন্দ্রের নাম যদি সহস্র-লোচন, সূর্যের নাম সহস্ররশ্মি।

সত্যপরায়ণ মহাবীর কর্ণের কাছে উপস্থিত হলেন দিবাকর।

'আমার হিতকথা শোনো।' বিভাবসু বলতে লাগলেন স্নিগ্ধস্বরে, 'তোমার স্বভাবের কথা জানতে পেরেছে সুররাজ।'

'আমার স্বভাবের কথা?' কর্ণ চমকে উঠলো।

'হ্যাঁ, তুমি কারু কাছে কিছু প্রার্থনা করো না অথচ তোমার কাছে যে যা চায় তাই বিলিয়ে দাও অকাতরে।'

প্রীতিপ্রফুল্ল মুখে হাসতে লাগলো কর্ণ।

'তোমার এই স্বভাবের কথা জানতে পেরে ইন্দ্র তোমার থেকে তোমার কবচকুণ্ডল চেয়ে নিতে আসবে। খবরদার, তুমি কিছুতেই দেবে না। তোমার পরাভব ও অর্জুনের জয়ই তার কাম্য। শুধু পরাভব কেন, কবচকুণ্ডল থেকে বিচ্যুত হলে তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং ধনরত্ন ও অন্যান্য পার্থিব সম্পদ দিয়ে পুরন্দরকে নিবারিত করবে।'

'ব্রাহ্মণবেশে আপনি কে?' কর্ণ প্রশ্ন করলো।

'আমি মরীচিমালী সূর্য। তোমার পরম সুহৃদ। আমার কথা শোনো। আমার কথা রাখলে তোমার শ্রেয়োলাভ হবে।'

কর্ণ প্রণত হলো। বললো, 'আমি যদি আপনার প্রীতিভাজন তবে কেন আপনি আমাকে আমার ব্রত থেকে পরাঙ্মুখ করতে চান? কেন আমি আমার স্বধর্ম থেকে স্খলিত হবো? দেবরাজ ইন্দ্র যদি পাণ্ডবদের হিতকামনায় কবচকুণ্ডল ভিক্ষে করেন আমি তাঁকে তা দিয়ে দেবো।'

মূর্খ, না উন্মত্ত! সূর্য ধিক্কার দিয়ে উঠলেন: 'কবচকুণ্ডল আছে বলেই তুমি যুদ্ধে অবধ্য। ও দিয়ে ফেললে তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত।'

'হোক মৃত্যু।' কর্ণ বললো গম্ভীর স্বরে, 'অকীর্তিকর জীবনের চেয়ে যশস্কর মৃত্যুই শ্রেয়। মৃত্যুর ভয়ে আমার ত্রিভুবনসঞ্চারিণী কীর্তিকে ম্লান হতে দেবো না।'

সূর্য বিদ্রূপ করে উঠলেন, 'মৃত ব্যক্তিদ আবার কীর্তি কি! সে কি করে জানতে আসছে তার কীর্তির কথা। একমাত্র জীবিতাবস্থায়ই কীতি উপভোগ্যা। সুতরাং যাতে বেঁচে থেকে কীর্তি আস্বাদ করতে পারো তার উপায় দেখো। শত্রুনিপাত করে যুদ্ধবিজয়ই পরম কীর্তি। শোনো, সন্নিহিত হলেন দিবাকর, 'হয় অকর্ণ নয় অনর্জুন, এই তো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ কথা। কেন অকারণে প্রাণ দান করবে। তুমি যদি কবচকুণ্ডলসম্পন্ন থাকো দেবরাজ ইন্দ্রের শত সাহায্য পেলেও স্পর্ধিত অর্জুন তোমাকে পরাস্ত করতে পারবে না। আমার উপদেশ শোনো। রমণীয় মধুর বাক্যে ইন্দ্রকে তৃপ্ত করে বিদায় দিয়ে দিও। কদাচ কুণ্ডলকবচ খুলো না গা থেকে। খুললেই মৃত্যু।'

বিচলিত হলো না কর্ণ। বললো, 'মৃত্যুর চেয়েও বেশি ভয় করি মিথ্যাকে। যখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যাচক কখনো প্রত্যাখ্যাত হবেনা আমার কাছে, তখন সে সত্য আমি জীবনপণে পালন করবো। অর্জুনের কথা ভেবে কেন আপনি এমন উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। আমি দ্রোণাচার্য ও জামদগ্ন্যর থেকে যে অস্ত্র পেয়েছি অর্জুনকে পরাস্ত করতে তাই যথেষ্ট।'

মোটেই নিরুদ্বেগ হতে পারলেন না ভাস্কর। বললেন, 'কিন্তু কবচকুণ্ডল থাকলেই সে-সব অস্ত্র কার্যকরী হবে। একমাত্র কবচ-কুণ্ডলেই শত্রুঘাতিনী অমোঘ শক্তি নিহিত। তাই তো তা হরণ করতে উদ্যোগী হয়েছেন দেবরাজ।'

তবু কর্ণের এতোটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই। বললো, 'ভগবন, শরীর অচির-স্থায়ী। শরীরের সঙ্গে সহজাত যে কবচকুণ্ডল তাও ক্ষণভঙ্গুর। আমি যদি ক্ষণভঙ্গুর দ্রব্যের বিনিময়ে চিরস্থায়িনী কীর্তি লাভ করতে পারি সে সুযোগ আমি ছাড়ি কেন? আমার ব্রত ভঙ্গ করতে আদেশ করবেন

না। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র যদি আমার জীবন প্রার্থনা করেন, তাও আমি তাঁকে দিয়ে দেবো অকাতরে। আমার সত্য থেকে আমার সঙ্কল্প থেকে আমি ভ্রষ্ট হবো না কিছুতেই।'

এই হচ্ছে স্বধর্মে নিয়ত স্থিত থাকা। সূর্য চন্দ্র টলুক, আমি টলছিনে। এই বসলাম আমার আসনে, শরীর শুষে যাক, কঙ্কালীকৃত হোক, তবু আমার সাধনফল উদ্ধার না করে উঠবো না। এই বেরুলাম যাত্রায়, মৃত্যুদুঃখবন্ধুর দুর্গম পথে, অমৃতকে আবিষ্কার না করে থামবো না।

সেই দুর্বার যাত্রীই বিবেকানন্দ।

প্রথমে চলে এলো কাশী। এখানেই এসেছিলেন বুদ্ধদেব, এখানেই এসেছিলেন শঙ্করাচার্য। কতো ধর্মপ্রচার করে গিয়েছেন। এখানকার স্পর্শ না নিয়ে গেলে যাত্রা শুদ্ধ হবে না।

একদিন ফিরছে দুর্গাবাড়ি থেকে, কতকগুলি বাঁদর জোট বেঁধে বিবেকানন্দকে তাড়া করলো। ভয় পেয়ে ছুটতে লাগলো স্বামীজী। ভাবলো—পলায়নেই বুঝি মুক্তি।

কে সহসা হুঙ্কার করে উঠলো ঃ 'থামো, পালিয়ো না। রুখে দাঁড়াও ওদের সামনে।'

বিবেকানন্দ তাকিয়ে দেখলো কে একজন সন্যাসী তাকে উপদেশ দিচ্ছে। সাহসে ভর করে রুখে দাঁড়ালো বিবেকানন্দ। বানর দলের মুখোমুখি হলো। আর যায় কোথা! উদ্ধত-উদ্যত ভঙ্গি দেখে বানরের দল চম্পট দিলো।

পরবর্তীকালে ন্যুইয়র্কে এক সভায় বক্তৃতা দিতে উঠে স্বামীজী বলেছিলো ঃ 'দাঁড়াও জীবনের মুখোমুখি। অজ্ঞানের সম্মুখীন হও। অবিদ্যার সম্মুখীন হও। দাঁড়াও বুক ফুলিয়ে পাল্লিয়ে, যেও না। যেও না পাশ কাটিয়ে।'

কাশী থেকে অযোধ্যা হয়ে আগ্রায় এসেছে বিবেকানন্দ। আগ্রা থেকে বৃন্দাবন। সমস্ত রাস্তা পায়ে হেঁটে এসেছে। পকেটে একটা কানাকড়ি পর্যন্ত নেই। পথে যা ভিক্ষে জুটেছে তাই খেয়েছে। সব

দিন জোটেওনি। ঘুমিয়েছে এখানে-সেখানে, কখনো বা খোলা মাঠে, উদার-উদ্ঘাটিত তারকা-আকীর্ণ আকাশের নীচে।

কোথায় চলেছি কে জানে! শুধু এইটুকু জানি ফিরে যাওয়া নেই। নেই থেমে পড়া।

গাছতলায় বসে কে একটা লোক তামাক খাচ্ছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে। লোকটার মুখে প্রগাঢ় তৃপ্তির শান্তি। শ্রমবিমোচনের আরাম।

খানিকক্ষণ তার দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো স্বামীজী। আহা, এক ছিলিম যদি তামাক পেতাম এ সময়। কতো দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছি, পায়ের দড়ি ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যাচ্ছে। কলকেতে যদি দিতে পারতাম একটা স্নখটান, পথশ্রম ধুয়ে মুছে যেতো। চাঙ্গা হয়ে উঠতাম মুহূর্তে।

'ভাই, তোমার কলকেটা একটু দেবে? একটা টান দিই—'

ত্রস্ত-লজ্জিত হলো লোকটা। কুণ্ঠিত হয়ে বললো, 'মহারাজ, আমি ভাঙ্গি, আমি মেথর—'

প্রসারিত হাত গুটিয়ে নিলো স্বামীজীর। মেথরের উচ্ছিষ্ট কলকে কি করে মুখে দেয়! আরামের মুখে ছাই দিয়ে ফিরে চললো। এগিয়ে চললো। শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে আরো কতো পথ চলতে হবে তার ঠিক কি।

খানিকটা এগিয়ে এসে থেমে পড়লো বিবেকানন্দ। একি, আমি সন্ন্যাসী না? আমি না সমস্ত সংসারশৃঙ্খল ছিন্ন করেছি? আমার না সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শনের কথা? তবে কেন মেথর জেনে ওর কলকেতে আমি মুখ দিতে পারলাম না? আজও আমার জাতের গর্ব—আভিজাত্যের মোহ! ওই মেথর কি ব্রহ্মের প্রতিভাস নয়? ও কি নয় আমার প্রভুর প্রতিভূ? ওকে অবজ্ঞা করে এ আমি কোথায় চলেছি, কোন্ মানবপ্রেমের তীর্থসত্রে?

ফিরলো বিবেকানন্দ। দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে এলো সেই মেথরের কাছে! বললো, 'শীগগির আমাকে এক ছিলিম তামাক সেজে দাও।'

'মহারাজ, আমি যে মেথর—'

'কে বললো? তুলি নারায়ণ। দাও, শীগগির দাও। ধোঁয়ার জন্যে আমার আকণ্ঠ শুকিয়ে গেছে।'

কোনো আপত্তিতেই ঠেকানো গেলো না। অগত্যা ভরাট করে তামাক সেজে দিলো। পূর্ণ তৃপ্তিতে তাই টানতে লাগলো স্বামীজী।

রসকে মেথর ছিলো দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির ঝাড়ুদার। তার সঙ্গে পঞ্চবটীর কাছে একদিন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা। কোমরের গামছা-খানা খুলে গলায় জড়িয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করলো।

ঠাকুর জিগ্যেস করলেন, 'কিরে রসিক, ভালো আছিস তো?'

করজোড়ে রসিক বললো, 'আমাদের আবার ভালো থাকা! আমরা মেথর, হীন জাত, হীন কর্ম করি—'

ঠাকুর ফোঁস করে উঠলেন; 'হীন কর্ম? কর্ম কি কখনো হীন হয়? স্বয়ং নারায়ণ ঝাড়ুদার সেজে তোর দুই হাত দিয়ে দক্ষিণেশ্বরে মায়ের দরবার ঝাঁট দিচ্ছেন—বল্, নারায়ণ কি হীন জাত?'

সে-সব কথা কি বিবেকানন্দ ভুলে গিয়েছে?

ঠাকুর পরীক্ষা করে দেখছেন। পরীক্ষা করে দেখছেন পূর্ব সংস্কার দূরীভূত হয়েছে কিনা, জাতিবর্ণের পরপারে চলে গিয়েছে কিনা।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে বিবেকানন্দ।

আলোয়ারে পণ্ডিত শম্ভুনাথের বাড়িতে আছে বিবেকানন্দ। এক ভক্ত মুসলমান এসে হাজির। স্বামীজীর দর্শন চাই।

আমিও জ্ঞানী, তুমিও জ্ঞানী—লেগে যাবে তর্ক, লেগে যাবে ঠোকাঠুকি, যেন ইটে-ইটে সঙ্ঘর্ষ। কিন্তু আমিও ভক্ত, তুমিও ভক্ত, কোনো বিবাদ নেই, বিরোধ নেই। আমিও একতাল কাদা, তুমিও একতাল কাদা। কাদায়-কাদায় সমন্বয়।

মৌলভীসাহেবের শুধু দর্শনে সুখ নেই, তার ইচ্ছে স্বামীজীকে সে খাওয়ায় নিজের হাতে।

প্রস্তাব করতেও ভয় করে। পণ্ডিতজী অন্তত তেড়েফুঁড়ে উঠবেন। বাড়ির বার করে দেন কিনা তারই বা ঠিক কি।

তবু উপায় নেই, অন্তরের ব্যাকুলতার কথা বলতেই হবে খুলে। যার আশ্রয়ে স্বামীজী আছেন তাকেই বলতে হয়।

'আমার বড়ো সাধ,' হাতজোড় করে আতঙ্কজড়িত কণ্ঠে বললো মৌলভী, 'স্বামীজীকে আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ভিক্ষে দিই।'

জিজ্ঞাসু চোমে তার দিকে তাকালো একবার শম্ভুনাথ। সেই চাহনিতে করাল কটাক্ষ ঝলসে উঠলো কিনা কে জানে।

'নতুন হাঁড়ি-বাসন কিনে আনবো বাজার থেকে। বামুন দিয়ে রান্না করাবো।'

প্রতিপক্ষের তবু যেন কোনো চাঞ্চল্য নেই। মৌলভীর মনে হলো আরো কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে হয়তো। বিনয় বিগলিত স্বরে বললো, 'আমার রসুই ঘরে রান্না করাবো না। বৈঠকখানা ঘরের সব জিনিসপত্র সরিয়ে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে নেবো। সেইখানে বামুন দিয়ে নতুন উনুন পাতিয়ে রান্নার আয়োজন হবে। আহা, স্বামীজী খাবেন, আর আমি দূরে দাঁড়িয়ে—অনেক দূরে দাঁড়িয়ে—তাই দেখবো।'

'কোনো কিছুর প্রয়োজন হবে না।' বিবেকানন্দ বললো প্রসন্ন মুখে : 'খাবো আপনার বাড়ি। কিন্তু কবে? দেখবেন যেন দেরি করে ফেলবেন না—'

'না না, কাল—কালই সব আয়োজন করবো।' আনন্দসাগরে ভাসতে-ভাসতে বললো মৌলভীসাহেব।

'আপনি যা সব ব্যবস্থা করছেন,' শম্ভুনাথ পণ্ডিত বললো, 'আমার নিজেরই খেতে সাধ হচ্ছে।'

ঠাকুর বলেন, ভক্ত হচ্ছে এক খেয়ার জল। যতোক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান-বিচার ততোক্ষণ পর্যন্ত আলের বাঁক, আর ঘুরপথ। কিন্তু বন্যায় যখন মাঠ ভেসে যায় তখন কে আর আলের সন্ধান করে! তখন জল কেটে সোজা বেরিয়ে পড়ো। ভক্তি-ভালোবাসা চলে এলে তখন

আবার ভেদবুদ্ধি কি, ভাগ-বণ্টন কি, জাত-বেজাত কি, সব জলে জলময়, সব একজোট, একাকৃতি।

কিন্তু কে কাকে খাওয়ায়? খাদ্যই বা কি, খাদকই বা কে!

ঠাকুর যখন নরেনকে ছুঁয়ে দিয়েছিলেন আর যখন তার চোখের সমুখ থেকে জড়জঞ্জালের পর্দা উঠে গেলো তখন সে দেখেছিলো মর্তের ধূলিকণা থেকে আকাশের নক্ষত্রকণা পর্যন্ত সমস্তই ঈশ্বর। রাত্রে বাড়িতে ফিরে এসে খেতে বসেছে, তন্ময় হয়ে দেখছে ঈশ্বর থালা-বাটি ভাত-ডালের মধ্যে বসে আছেন।

নিস্পন্দ হয়ে আছে দেখে মা বললেন, ও কি—হাত গুটিয়ে কেন?

যন্ত্রচালিতের মতো খেতে শুরু করলো নরেন। কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করলো, যে খাচ্ছে যাকে খাচ্ছে আর যিনি খাওয়াচ্ছেন সবই সেই ঈশ্বর।

কারু কাছ থেকে ভিক্ষা চাইবো না—বৃন্দাবনে এসে সঙ্কল্প করলো বিবেকানন্দ। বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি—নিজের গোঁয়ে চলে যাবো পথ কেটে। থামবো না, দাঁড়াবো না কারু দুয়ার ধরে।

একে নিদারুণ ক্ষুধা, তার উপর বৃষ্টি শুরু হয়েছে। খরশরধার বৃষ্টি। তবু পথ কেটে চলেছে স্বামীজী। হাতে দণ্ড আর কমণ্ডলু। আর বুকের মধ্যে রামকৃষ্ণের অগ্নিয়মূর্তি। হে পরমরমণীয় রাম, হে ত্রৈলোক্যাকর্ষী কৃষ্ণ, ক্ষুধারূপেও যে তুমি, শ্রান্তিরূপেও যে তুমি, অপ্রাপ্তি-অলব্ধিও যে তুমি, দেহপাত হবার আগে তাই আস্বাদন করতে দাও।

'মহারাজ, শুনছেন—' পিছন থেকে কে একজন ডাকলো।

ফিরেও তাকালো না বিবেকানন্দ। সামনে চললো সমানে।

'শুনছেন—'

পিছন ফিরে তাকাবার সময় নেই। পিছনেই মায়া, অবিদ্যা, সংসারবল্লী। সর্ববন্ধন উপেক্ষা করে এগিয়ে চালাই বীরত্ব। কিন্তু পা চলছে না যে। ক্ষুধায় সমস্ত শরীর ঝিমিয়ে আসছে! শুধু ক্ষুধায় নয়, পর্যটনে। শুনিনা, লোকটা কি বলে! কোনো বিপদে পড়েছে বোধহয়! বিপন্ন প্রার্থীর মতোই কাতর কাকুতি। হয়তো সেবা চায়,।

প্রভু, রক্ষা করো। যখন পিছন ফিরে তাকাবো না বলেছি তখন সন্তানের প্রতিজ্ঞার মান রাখো। প্রার্থনার প্রলুব্ধ করো না। কে বলে পা চলছে না? করুণ মিনতির স্বর যে ক্রমশই এগিয়ে আসছে। বিবেকানন্দ ছুটতে লাগলো।

'শুনছেন—' পশ্চাদ্বর্তী যে মিনতির স্বর, সেও ছুটতে লাগলো।

কি সর্বনাশ, স্বামীজী যতো ছোটে তার চয়েও জোরে ছোটে সেই পশ্চাদগামী কাকুতি।

প্রায় এক মাইল ছোটবার পর পিছনের লোকটি ধরে ফেললো স্বামীজীকে। পরাস্ত করলো, এগিয়ে এসে দাঁড়ালো সামনে। হাঁপাতে-হাঁপাতে বললো, 'মহারাজ আপনার জন্যে খাবার এনেছি।'

স্বামীজীর তো চক্ষুস্থির!

গামছা দিয়ে বাঁধা প্রকাণ্ড খাবারের চ্যাঙাড়ি। নানারকম ভোজ্য-দ্রব্য বোঝাই।

এ খাবার কে পাঠালো এ আর জিগ্যেস করলো না বিবেকানন্দ। তার জানতে বাকি নেই। সে কেঁদে ফেললো।

গাজীপুরে আছে। কলকাতা থেকে খবর এল বলরাম বোস আর নেই। খবর শুনে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো স্বামীজী।

'সেকি, আপনি না সন্ন্যাসী?' কে একজন জিগ্যেস করলো।

শোকাবেগ প্রশমিত করে বিবেকানন্দ বললো, 'সন্ন্যাসী বলে কাঁদতে পাবো না?'

'উচিত নয়। হৃদয়কে কঠিন করতে না পারলে সন্ন্যাসী কিসের!'

'যে সন্ন্যাস হৃদয়কে পাষাণে পরিণত করে সে সন্ন্যাসে ধিক।' জ্বলে উঠলো স্বামীজী: 'বলরাম আমার গুরুভাই। আমরা এক গুরুর চরণতলে বসে পাঠ নিয়েছি। এক বৃক্ষ আমাদের ফল দিয়েছে ছায়া দিয়েছে—' একটু স্তব্ধ হলো বিবেকানন্দ, পরে ফের

বললো, 'শুধু বলরামের জন্যে কেন, জগজ্জনের জন্যে আমাকে কাঁদতে হবে। অগণিত জনগণকে যদি আমার আত্মজন বলে অনুভব না করতে পারি, তাদের ব্যথায় ব্যথিত হতে না পারি তবে কিসের ছাই আমার সন্ন্যাসী হওয়া! তুমি কি মনে করো সন্ন্যাসী হয়েছি বলে আমি বিমুখ-বিরস হয়ে থাকবো? নির্লিপ্ত নিশ্চিন্ত? অসম্ভব। অবিশ্যি অভিভূত হবো না সংকল্পভ্রষ্ট হবো না কিন্তু পরের দুঃখে থাকবো উদাসীন হয়ে, দ্রবীভূত হবো না, আমার এ ব্রত নয়। যেখানে পারি তুলে দিয়ে যাবো কাঁটা, যেখামে পারি মুছে দিয়ে যাব অশ্রু—'

এর ক'দিন পরে আবার খবর এলো, স্বামীজী তখন আলমোড়ায়, বোন মারা গিয়েছে। শোকে আবার ভেঙে পড়লো স্বামীজী।

কিন্তু তার তো আত্মবিস্মৃত হবার কথা নয়। সুতরাং পুনরায় রওনা হও। শোক থেকে অশোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে, দুর্গম থেকে দুঃসাধ্যে সেই দুর্লভ অথচ দুষ্পরিহরের সন্ধানে।

বাড়ির লোক কি করে আলমোড়ার ঠিকানা পেলো? সুতরাং পদক্ষেপ দ্রুত করো, চলে যাও আরো নির্জনে, গহনে গভীরে, হিমালয়ের প্রস্তর-অরণ্য আশ্রয় করো, সেখানে গিয়ে জাগাও প্রসুপ্তকে, গুহাহিতকে, তোমার অন্তর্নিহিতকে।

কিন্তু বোনের কথাটাও একেবারে ভুলে থাকলে চলবে না! সে আত্মহত্যা করেছে। সমাজের অনুশাসনে নিগৃহীত নারীত্বের সে একটি মৌন প্রতীক। তারই মধ্য দিয়ে দুর্গত নারীসমাজ প্রতীকার চাইছে তার কাছে। জগজ্জনের যদি দুঃখ বিমোচন করতে না পারি তবে কিসের আমার সন্ন্যাস, আমার সর্বত্যাগ, আমার প্রব্রজ্যা? সেই সঙ্কল্প আবার মনে পড়লো বিবেকানন্দের। কিন্তু দাঁড়াও, আগে উদ্ধার করে আনি সঞ্জীবনা, সেই আরোগ্য-আয়ুষ্যের মহৌষধ।

গাড়োয়ালের দিকে যাত্রা করলো বিবেকানন্দ। সঙ্গে সারদানন্দ, অখণ্ডানন্দ আর বৈকুণ্ঠ। কর্ণপ্রয়াগে এসে অখণ্ডানন্দ অসুখে পড়লো। স্বামীজীও তার সঙ্গ নিলো। শোক গেলো, এবার বাধা এলো রোগের

মূর্তি ধরে। আসুক! বাধাকে উল্লঙ্ঘন করতে না পারবো তো বুকের মধ্যে রামকৃষ্ণ কেন?

চটীতে বিশ্রাম করি আর ক'দিন। রোগ আপনিই অদৃশ্য হবে।

তাই হলো। সাতদিন পরে আবার যাত্রা রুদ্রপ্রয়াগের দিকে।

এবার রুদ্র দেখা দিলো প্রলয়ঙ্কর জ্বর হয়ে। বিবেকানন্দ আব অখণ্ডানন্দ তু'জনেই ঘায়েল হলো। শয্যা বলতে তো ভূমি, সেই মাটি থেকে ওঠে তাদের সাধ্য কি!

ঠাকুর, আর কি তুমি এগুতে দেবে না? স্পর্শ করতে দেবে না কি সে মহামৌনকে?

কোথা থেকে কে জানে, গাড়োয়াল জেলার সদর আমিন এসে হাজির! একি, সাধুরা যে মাটির সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে? এদের কেউ কি দেখবার নেই? তোলবার নেই?

না, নিশ্চয়ই আছে। তোমাকে তো ঠাকুর পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আমিনের কাছে কি কবিরাজি ওধষু ছিলো তাই খেতে দিলো সাধুদের। মন্ত্রবৎ কাজ করলো। উঠে বসলো তু'জনে।

কিন্তু শরীরের এ অবস্থায় পর্বতপর্যটন অসম্ভব। সুতরাং ডাণ্ডি যোগাড় করে দিচ্ছি, শ্রীনগর চলে যাও। সেখানে গিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা ও বিশ্রামে শরীরকে শক্তসমর্থ করো।

যাবো তো, কিন্তু খাবো কি! অসুস্থ দেহ নিয়েই ভিক্ষা করতে হলো পথে-পথে। শুধু চিকিৎসা বিশ্রামেই তো চলবে না, পথ্য চাই। যিনি পথ দিয়েছেন তিনিই কি পথ্য জোগাবেন না?

শ্রীনগরে মাসখানেক থেকে আবার তারা চললো টিহিরির দিকে।

'গঙ্গাতীরে আমাকে একটি সাধনার স্থান তৈরী করে দিতে পারেন?' টিহিরিরাজের দেওয়ান রঘুনাথ ভটচাজ্যিকে একদিন জিগ্যেস করলো বিবেকানন্দ।

'পারি।' দেওয়ান রঘুনাথ বললো, 'গণেশ প্রয়াগে চলে যান। গঙ্গা আর ভিলাঙ্গন নদীর সঙ্গমে। সেখানে আপনার জন্যে, নির্জনে, একটি কুটির নির্মাণ করে রেখেছি।'

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো স্বামীজী। মহামৌন এবার বুঝি খুলে দেবে রুদ্ধ দ্বার।

গণেশ প্রয়াগ যাবার সব ঠিকঠাক, অখণ্ডানন্দের আবার অসুখ হয়ে পড়লো। এবার শুধু জ্বর নয়, জ্বরের সঙ্গে ব্রঙ্কাইটিস।

উপায়? ডাক্তার বললো, শীগগির পাহাড় থেকে নেমে যাও নীচে। অন্তত দেরাদুনে।

সমস্ত সংকল্প ভেস্তে গেলো। ঠাকুর, এ তোমার কী বিধান-বাসনা! যখন মনে করি যাবো এবার নীরব গভীরের অতল রাজ্যে, তখনই একটা-না-একটা বাধা এসে উপস্থিত হয়। গুরুভাইদের তুমিই তো আমার হাতে জিম্মা করে দিয়েছো। তাদের অসুখের সময় তাদেরই বা ফেলি কেমন করে?

'আমার গুরুভাই অসুস্থ। তাকে কেউ কি তোমরা একটু থাকবার মতো জায়গা দেবে? খাবার মতো একটু পথ্য?' দ্বারে-দ্বারে প্রার্থনা করতে লাগলো স্বামীজী।

কেউ প্রতিধ্বনিও করে না।

অনেক ঘোরাঘুরির পর পণ্ডিত আনন্দনারায়ণ নামে এক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের দরজা খোলা পেলো! ব্রাহ্মণ ভার নিলো সেবাশুশ্রূষার।

'ভালো হয়ে এলাহাবাদ চলে যাস।' অখণ্ডানন্দকে এই পরামর্শ দিয়ে অন্যান্য গুরুভাইদের সঙ্গে বিবেকানন্দ চলে গেলো হৃষীকেশ।

এবার বসে পড়তে হয় সাধনায়। দুর্জয় তপশ্চর্যায়। আয়, কোনো গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ি, নয়তো দুষ্প্রবেশ্য অরণ্যে।

কিন্তু মনোরথ তোমার, রথের রশ্মি ঈশ্বরের হাতে। নির্বাচিত মুহূর্তে স্বামীজীর অসুখ করে গেলো। প্রচণ্ড জ্বরের সঙ্গে ঘোরতর প্রলাপ শুরু হলো।

দেখতে-দেখতে সঙিন হয়ে দাঁড়ালো অবস্থা। সংজ্ঞা লোপ পেয়ে গেলো, নাড়ীও প্রায় ছাড়ো-ছাড়ো। গুরুভাইয়েরা দশদিকে অন্ধকার দেখলো। কি করবে, কোথায় যাবে, কোথায় পাবে রোগের উপশম! মাটির উপরে একটা কম্বল, তাতেই শুয়ে স্বামীজী ছটফট করছে। একটু নরম বিছানা পর্যন্ত যোগাড় করতে পারছে না! কোন্ ডাক্তারই বা আসবে বিনা পয়সায় রুগী দেখতে। ডাক্তার এলেও ওষুধ কেনবার পয়সা আসবে কোত্থেকে? চরম অসহায়ের মতো গুরুভাইয়েরা কাঁদতে বসলো। ঠাকুর, তুমিই অগতির গতি, তুমিই অনাথের নাথ। তুমি নির্বান্ধবের বন্ধু, তুমি নিষ্কিঞ্চনের সর্বস্ব।

কে একটা পাহাড়ী লোক চলে এলো কুটিরে। অমি ওষুধ দিচ্ছি। কি একটা পাহাড়ী গাছের শিকড় বেটে তার সঙ্গে খানিকটা মধু মিশিয়ে খেতে দিলো স্বামীজীকে। জয় জগৎগুরু জগন্নাথ! স্বামীজী চোখ মেললো। জ্বর নেমে গেলো আস্তে-আস্তে।

সুস্থ হয়ে উঠে বিবেকানন্দ বললো গুরুভাইদের, 'তোমাদের অসুখ হলে আমি দেখবো আর আমার অসুখ হলে তোমরা দেখবে এ এক রকম মায়া। এ মায়াবন্ধন কাটতে হবে নিষ্ঠুর হাতে, এ মায়াই আমার তপশ্চরণের বাধা। আমাকে এবার তোমরা ছেড়ে দাও, আমি এবার সম্পূর্ণ একা, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে যেতে চাই। যাতে ঘোরতম দুর্দিনেও ভাবতে পারি—আমার পাশে গুরুভাইরাও কেউ নেই। কেবল আমি আছি আর তিনি আছেন।'

গুরুভাইয়েরা কোলাহল শুরু করলো। আমরা যাবো সঙ্গে।

'আমাকে পিছু ডেকো না। মায়াপাশ ছিন্ন করাই আমার স্বধর্ম। স্বধর্ম থেকে আর ভ্রষ্ট হবো না। সন্ন্যাসীর প্রতি অনুরাগও মায়া।'

একা-একা চলে গেলো বিবেকানন্দ।



ছোটো নরেনের আসল নাম নরেন মিত্তির। ইস্কুল থেকে সটান চলে আসে দক্ষিণেশ্বরে। ঈশ্বরের জন্য কাঁদে। কান্না একবার শুরু হলে কি আর থামতে চায়! ঠাকুর বলেন, 'কান্না কি আর কমেতে হয়!' সব আগুনই নেভে। সব কান্নাই থামে এক সময়। শুধু, ঈশ্বরের জন্য যে আগুন, তা নেভে না। ঈশ্বরের জন্যে যে কান্না তার আর বিরতি নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ক'টি ছোটো ছেলে



দক্ষিণেশ্বরে আসে লুকিয়ে লুকিয়ে। আসে বলে অভিভাবকরা শাসন করে, পীড়ন করে। তবু কি যে নেশা কে বলবে, এক নাগাড়ে দু-তিনদিন এসে থেকে যায়। স্কুলের কথা মনেও থাকে না। জীবনের আসল যে জ্ঞান তাই যেন ছড়িয়ে আছে ঠাকুরের চারপাশে। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে আছে পায়ের ধূলোয়। পরা-বিদ্যার পাঠশালা এই দক্ষিণেশ্বর।

যদি আবার না আসে, তার জন্য ছটফট করেন ঠাকুর। এলে গায়ে মাথায় হাত বুলোন। মিনতি করেন 'আসিস এক-একবার। বড়ো শুদ্ধ আত্মা তোর। তোর মধ্যে মন্দের গন্ধ নেই এতোটুকু।'

সেদিন বললেন, 'অচ্ছো, তোর শরীর দেখি। খোল দেখি জামা।'

জামা খুলে ফেললো ছোটো নরেন।

খুশি হলেন ঠাকুর। বললেন, 'বা, বেশ বুকের আয়তন। তবে হবে। তবে মাঝে মাঝে আসিস। একেবারে ভুলে যাসনে।'

যেন ঠাকুরেরই যতো দায়!

দায় না দয়া, কে বলবে! মমতার স্পর্শে চোখ ছলছল করে ওঠে ছোটো নরেনের। একদিন ঠাকুর তাকে জিগ্যেস করলেন, 'তুই কী ভালোবাসিস?'

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো ছোটো নরেন। তোমাকে ছাড়া আর কী আছে ভালোবাসার?

'কী ভালোবাসিস? জ্ঞান না ভক্তি?'

ছোট নরেন তার কি জানে? তবু বললো, 'শুধু ভক্তি।'

'কিন্তু না জানলে কাকে ভক্তি করবি? মাষ্টারকে যদি না জানিস, ভক্তি করবি কাকে?' মাষ্টার মশায়ের দিকে তাকালেন, 'তবে ছোটো নরেন যেহেতু শুদ্ধাত্মা, আর যেকালে ও বলেছে শুদ্ধা ভক্তি চাই, তাহলে নিশ্চয়ই এর একটা মানে আছে।'

তুমি কে, জানি না! সাধ্যিও নেই। তবু তোমার দিকেই মন ছুটে চলেছে। না জেনে না চিনেই তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি।

তোমার এমনি মজা! জানার আগেই টানা। দেখিনি, শুনিনি, তবু মন বলে এমন আর দু'টি নেই। কেউ শিখিয়ে দিলো না! তবু নিজেকে বিকিয়ে দিলাম।

কপালে ছোটো একটি আব আছে নরেনের। পঞ্চবটীতে বেড়াতে বেড়াতে ঠাকুর বলছেন, 'তুই আবটা কাটা না। ও তো গলায় নয় মাথায়—ওতে আর কি হবে!'

সমাধির পর উঠে দাঁড়িয়ে ঠাকুর যখন টলতে থাকেন তখন ছোটো নরেন এসে তাঁকে ধরে। ছোটো নরেনের শুদ্ধ-শীতল দেহ, ঠাকুর সে স্পর্শ সইতে পারেন সহজে। কিন্তু সেদিন হলো কি, সমাধির পর ছোটো নরেন ধরতে যেতেই ঠাকুর যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলেন।

কি হলো? বিমর্ষ হয়ে গেলো ছোটো নরেন। তবে কি কোনো দোষ করেছি? মনে কি আমার মলিনের স্পর্শ লেগেছে? নইলে আর্তনাদ করলেন কেন ঠাকুর?

ঠাকুর বললেন, 'তোর শরীরে ঘা।'

বাঁচা গেলো। ক'দিন আগে শরীরে একটা অস্ত্রোপচার হয়েছে তারই ঘা, শুকোয়নি। সেই কলুষসংসর্গ দুর্বিষহ ঠাকুরের কাছে।

তবু যাক। মনের ঘা নয়। মনের ঘা কিছুতেই শুকোতে চায় না। শুকোলেও দাগ যায়না কিছুতেই।

দক্ষিণেশ্বরে আসে বলে নারানকেও তার বাড়ির লোকেরা প্রহার করে। বামুনেদের ছেলে। স্কুলে পড়ে, কিন্তু পালিয়ে-পালিয়ে চলে আসে দক্ষিণেশ্বর। ঠাকুর তাকে গাড়ি ভাড়ার পয়সা দিয়ে দেন।

ছোটো খাটটির উপর পাশে বসিয়ে মিষ্টি খাওয়ান, জল খাওয়ান। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করেন।

সেদিন কানের কাছে মুখ এনে স্নেহ ঢেলে জিগ্যেস করলেন, 'কালও খুব মেরেছে?'

নারান মাথা হেঁট করে রইলো।

'এক কাজ কর। একটা চামড়ার জামা তৈরী কর। মারলে আর বেশী লাগবে না।

সেদিন কীর্তন শুনছেন ঠাকুর, কোত্থেকে নারান এসে কাছে দাঁড়ালো। তাকে দেখে চটে উঠলেন ঠাকুর। বললেন, 'তুই আবার কেন এসেছিস ? অতো মেরেছে তোকে সেদিন তোর বাড়ির লোক, আবার এসেছিস ? তোর শিক্ষে হবে না ?

চরম শিক্ষা নেবো তোমার পদচ্ছায়ে। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে ? কোথায় তবে আর যাবো ? যার তুমি আছো তার আবার ভয় কি। প্রহারই তো তোমার উপহার।

ঠাকুরের ঘরের দিকে গেলো নারান। নিজের বাড়ির দিকে নয় কিন্তু মোটেই সে গেলো না।

মমতায় প্রাণ গলে গেলো ঠাকুরের। বাবুরামকে বললেন, 'যা তো, ওকে কিছু খেতে দে।'

কতোক্ষণ পরে নিজেই চললেন খাওয়াতে। আশ্চর্য, কীর্তনে মন বসলো না। কোথায় হরিসরোবরে ডুবে যাবেন, তা নয়, চললেন কোথাকার একটা ছেলেকে খাওয়াতে।

মাষ্টারকে বলছেন, 'আহা, ওকে দেখলে যেন বাৎসল্য হয়। এখানে আসে বলে বাড়িতে মারে। ওর হয়ে বলে এমন বুঝি কেউ নেই।'

'আপনিই বোঝাবেন !'

'দেখো, ওর কতো বড়োসত্তা। কীর্তন ফেলে উঠে গেলাম ওর কাছে। কীর্তনের চেয়েও ওর টানের জোর বেশী। কীর্তন ফেলে উঠে গেছি কোনোদিন এমনটি আর হয়নি।'

'ক্রন্দনই তো শ্রেষ্ঠ কীর্তন।' বললেন মাষ্টারমশাই : 'ও মনে মনে কাঁদছে আপনার জন্যে, সেই টানেই তো উঠে পড়লেন।'

'কিন্তু জানো, ওকে যখন জিগ্যেস করলাম, কেমন আছিস ? তখন ও বললো, আনন্দে আছি। দুঃখ-কষ্টের কথা মনেও রাখে না।'

অনেকদিন আবার আসছে না নারান। বাবুরামকে বলছেন ঠাকুর, 'ওরে, একবার নারানের বাড়ি যা না। তাকে দেখে আয়। পারিস তো ডেকে আন।'

কিন্তু ওর বাড়িতে যেতে বড়ো ভয়, পাছে ওর বাবা ক্ষেপে ওঠেন, তেড়ে আসেন লাঠি নিয়ে।

'তবে এক কাজ কর। হাতে করে একখানি ইংরেজি বই নিয়ে যা। দেখে-শুনে ওর বাবা খুশি হবেন। কিচ্ছু বলবেন না।'

হঠাৎ একদিন নারানের মা এসেছে দক্ষিণেশ্বরে। কার টানে ছেলে এমন ঘরছাড়া তাকে নিজের চোখে দেখে আসতে। কে সে হাত বুলিয়ে সমস্ত মান ভুলিয়ে দেয়! কিসের টানে টলিয়ে দেয় বাধার পাহাড়!

দেখে তো তার চক্ষুস্থির! শুধু স্থির নয় বিমোহিত! ছেলের দোষ কি! তার নিজেরই তো ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না!

কণ্ঠ-ভরা কাকুতি নিয়ে ঠাকুর বললেন, 'মা, আমার নারানকে বেশী পীড়ন করো না—'

সত্যিই তো, তাঁরই তো নারান! মনে হলো ঈশ্বরের ছেলেকে কি বলে তিনি পীড়ন করেন! ছলছল করে উঠলো মায়ের চোখ।

'শোনো', আবার বললেন ঠাকুর, 'ভগবানের দিকে যদি ওর মন যায়, দুমড়ে দিওনা ওর মনটিকে।'

যেন ভিক্ষে করছেন ঠাকুর। যদি ঈশ্বরের দিকে কারু মন যায়, সে মনটি যেন তাঁর প্রাপ্য।

বরানগরের এক তেলির ছেলে গোবিন্দ পাল। ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরে ষোলোআনা মন। তাই ঠাকুরের কাছে এসে চুপটি করে বসে থাকে। যখন চারিদিক স্তব্ধ তখন হরিকথা শোনে।

বিষয়ীদের দেখলে বড়ো ভয় পায়। যেমন বেড়াল দেখলে ইঁদুর ভয় পেয়ে থাকে। ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা এসেছে বাগানে বেড়াতে,

তাড়াতাড়ি কুঠির ঘরের দরজা বন্ধ করলো। পাছে আবার তাদের সঙ্গে কথা কইতে হয়—এই কুণ্ঠা।

একদিন বললো, 'আমার একটি বন্ধু আছে। নাম গোপাল। গোপাল সেন। তাকে আনবো এখানে? আপনাকে দেখতে চায়।'

'নিয়ে আয় না। গোবিন্দ এসেছে, গোপাল আসবে, আমার তো মহাভাগ্য।'

আশ্চর্য, এ ছেলের যে ভাবসমাধি হয়। পঞ্চবটী তলায় ভাব হলো একদিন। ভাবে একদিন ঠাকুরের গায়ে হাত দিয়ে গোপাল বললো, 'আমি তবে যাই। আমি আর এ সংসারে থাকতে পারছি না। আপনার তো এখনো অনেক দেরি। সুতরাং আমি একলাই যাই।'

তখন ঠাকুরেরও ভাবাবস্থা। বললেন, 'বলো—আবার আসবে?'

'আচ্ছা, আবার আসবো।'

কদিন পর গোবিন্দ এসেছে একলাটি। মনমরা। মুখখানি যেন একেবারে ছায়া-ঢাকা।

'কিরে, গোপাল কই?'

'গোপাল আর নেই। গোপাল চলে গেছে।'

দশ-এগারো বছরের দু'টি ছেলে, পতু আর মণীন্দ্র। কাশীপুরে ঠাকুরের অসুখের সময় দেখা করতে এসেছে। কেউ ডাকেনি, কেউ বলেনি, নিজের থেকে চলে এসেছে প্রাণের টানে। সেবার তারা কি জানি, কাউকে প্রশ্ন তুলতেও দেয়না, বলে, 'আর কিছু না দাও চৌকাঠের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবো দিন-রাত।

পাখা পেয়েছে একদিন। একবার এ হাওয়া করে, আরেকবার ও। ঠাকুরের মাথায় তখন যন্ত্রণা, দিন-রাত হাওয়ার দরকার। কিন্তু ছোট-ছোট হাত, ঠিকমতো নাগাল পায়না। তবু ক্লান্তি নেই, সাধ্যের অতীত করে পাখা চালাচ্ছে।

'আমি যতোক্ষণ পাখা করছি, তুই ততোক্ষণ পা টেপ্।' মণীন্দ্রকে বলছে পতু। আর পতুকে বলছে মণীন্দ্র, 'তারপর তুই পা, আমি পাখা।'

দোলের দিন। বাগানে সবাই খুব হল্লা করছে, রং আর আবীরে হুলুস্থুল! বাড়ির সবাই নেমে গেছে নীচে। রুগীর কাছে শুধু পতু আর মণীন্দ্র।

ঠাকুর চোখ চাইলেন। বললেন, 'সেকি রে, তোরা রং খেলতে যাসনি? যা যা, নিচে যা, সব্বাই গেছে—তোরাও যা, আবীর খেল গিয়ে প্রাণ ভরে—'

পতু বললো গম্ভীর হয়ে, 'না মশাই, আমরা যাবো না। আপনি রয়েছেন, আমরা কি আপনাকে ফেলে যেতে পারি!'

ঠাকুর কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'ওরে, এরাই আমার সেই রামলালা, আমাকে সেবা করতে এসেছে। ছেলেমানুষ, তবু আমাকে ফেলে অন্যদিকে ফিরেও তাকালো না!'

বড়ো গরিব দু'টি ছেলে। কিন্তু ভক্তিধনে বিরাট ধনী।

'একজন আমার বড়ো নিন্দে করে।' বলেছেন ঠাকুর, 'কেবল বলে ছোকরাদের ভালোবাসে। কেন বাসবো না শুনি? ছোকরারা খাঁটি দুধ, একটু ফুটিয়ে নিলেই হয়। দই-পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখতে ভয় হয়, কিন্তু ছোকরারা নতুন হাঁড়ি, দুধ নিশ্চিন্ত হয়ে রাখা যায়।'

ধোঁয়া দেয়াল ময়লা করে কিন্তু আকাশের কিছু করতে পারে না। বালক হচ্ছে সেই নীল-আকাশের টুকরো।





ঠাকুরের অসুখ করেছে। গলায় ব্যথা।
কেন হবে না? ছেলেমানুষের মতো বরফ খেতে ভালোবাসেন—কাঁচা বরফ। দক্ষিণেশ্বরে যে যায় সেই বরফ নিয়ে যায়। মহা খুশি ঠাকুর। সরবৎ করে দাও তো ভালো, নয়তো সাদা জলের মধ্যেই বরফ ফেলে খাবেন ঢুক ঢুক করে।



শ্রীরামকৃষ্ণ ও কল্পতরু

তারপর কুলপি যদি পান তো কথা নেই।

শুধু তাই ?

তার উপর আবার হিম লাগানো আছে তো। গিয়েছিলেন পেনেটির উৎসবে,' বৃষ্টিতে ভিজে এসেছেন। গলার ব্যথা তাই দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে।

'বৃষ্টিতে এভাবে আপনি ভিজলেন কেন বলুন তো ?' ভক্তদের একজন শাসন করে উঠলো।

'তা আমি কি জানি !' বালকের মতো বললেন ঠাকুর : 'সব রামের দোষ।'

রামের মানে, রাম দত্তের। তার দোষ, যেহেতু সে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলো। যেহেতু সে বারণ করেনি।

'ও তো ক্যাম্বেলের পাশ-করা ডাক্তার। ও তো আমাকে জোর করে নিষেধ করতে পারতো !' ঠাকুর উলটো তখন নালিশ করলেন, 'ও তো আমাকে বলতে পারতো, বৃষ্টি হতে পারে এখন, মোটেই যাবেন না মশাই।'

গলায় ব্যথার জয়াগায় ডাক্তারি প্রলেপ লাগিয়েছেন। মুখখানা ভরে করে আছেন—অপরাধী বালকের মতো।

'সত্যিই তো, রামেরই অন্যায়।'

'নইলে দেখো না, নীচে জল ওপরে জল, রাম আমাকে সমস্তদিন সেখানে নাচিয়ে নিয়ে এলো !'

'যাক গে, এখন থাকুন সাবধান হয়ে। কথা ক-ওয়া বন্ধ করে দিন। লোকে বলে, সমস্তক্ষণ কথা কয়েই আপনার ব্যথা।'

'কথা কইবো না তো বাঁচবো কি নিয়ে ! কথাই তো আমার আনন্দ। কথাই তো আমার অমৃত।'

ঈশ্বর ভ্রমর হয়ে গুঞ্জন করছেন। বিহঙ্গ হয়ে কূজন করছেন। বাতাস হয়ে বাঁশি বাজাচ্ছেন বেণুবনে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই কূজন-গুঞ্জন। সেই শ্রবণলোভন বংশীধ্বনি।

ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার বললেন, 'শুধু আমার সঙ্গে কথা কইবেন, আর কারু সঙ্গে নয়।'

'কিন্তু বড্ড কাশি হয়েছে যে।' কাতরমুখে বললেন ঠাকুর।

'কাশি হয়েছে?' ডাক্তার রসিকতা করলেন: 'তা কাশীতে যাওয়া তো ভালো কাজ।'

সবাই হাসলো। ঠাকুরও হাসলেন। বললেন, 'তাতে তো মুক্তি গো। আমি মুক্তি চাই না, আমি ভক্তি চাই।'

মুক্তি তো সোজা, কোনো দায়িত্ব নেই, কোনো ভার বহন নেই। ভক্তিই কঠিন। কণ্টককে কুসুম মনে করাই ভক্তি। আঘাতকে মনে করা ঈশ্বরের আলিঙ্গন।

ভক্তি মানে, ঈশ্বরকে ভালোবাসা। অহেতুক ভালোবাসা। কোনো কারণ নেই তবু খুশিতে ভরে ওঠা। মধুরের শেষ না পাওয়া।

ডাক্তারের সঙ্গেই কথা কন ঠাকুর।

সমস্ত কিছুর মধ্যেই ভগবান জেগে রয়েছেন, ফুটে রয়েছেন, ফলে রয়েছেন সেই কথাটিই বোঝাচ্ছেন সেদিন।

কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, বলছেন ঠাকুর: 'তুমি আমাকে ঈশ্বর বলছো—তোমাকে একটা জিনিস দেখাই, দেখবে এসো।'

'অর্জুন গেলেন সঙ্গে-সঙ্গে। খানিকদূরে গিয়ে বললেন শ্রীকৃষ্ণ, কি দেখতে পাচ্ছো?

'অর্জুন বললেন, মস্ত একটা গাছ।

'কী ফলে আছে? প্রশ্ন করলেন শ্রীকৃষ্ণ!

'অর্জুন বললেন, দেখছি তো বহু কালো জাম থোলো-থোলো হয়ে ঝুলে আছে।

'শ্রীকৃষ্ণ বললেন, কালো জাম নয়। দেখো ভালো করে। আর একটু এগিয়ে এসে দেখো।

'তখন অর্জুন দেখলেন, থোলো-থোলো কৃষ্ণ ফলে আছে। কৃষ্ণ বললেন, এখন দেখলে? আমার মতো কতো কৃষ্ণ ফলে রয়েছে?'

ডাক্তার বললেন, 'এ-সব বেশ কথা।'

ঠাকুর খুশি হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ! কেমন কথা?'

'বেশ।'

'তবে একটা থ্যাঙ্ক-উই দাও!' হাসতে লাগলেন ঠাকুর।

পরিহাসের স্বচ্ছ জলের উপর ফুটিয়েছেন বর্ণাঢ্য ভাব-পদ্ম। ঈশ্বর-কথার চন্দনে স্নিগ্ধ করেছেন রোগ-যন্ত্রণা।

সকালে একটু ভাতের মণ্ড, ঝোল আর দুধ, সন্ধ্যায় আবার একটু দুধ আর যবের মণ্ড—এই পথ্য করছেন ঠাকুর। তবু এতো নিয়মে থেকেও রোগের কমতি নেই একটুও। বরং বৃদ্ধির মুখে।

'নিশ্চয়ই কুপথ্য করেছেন!' ডাক্তার শাসিয়ে উঠলো।

ডাক্তারের সঙ্গে ঠাকুরের ভাব তখন জমে গিয়েছে—তাই আর 'আপনি' নেই।

ঠাকুর মাথা চুলকে বললেন, 'কই, না তো!'

'আচ্ছা আজ কোন্-কোন্ আনাজ দিয়ে ঝোল রাঁধা হয়েছিলো?' কড়া গলায় প্রশ্ন করলেন ডাক্তার!

'আলু, কাঁচকলা, বেগুন—' ঠাকুর আবার মাথা চুলকোলেন: 'দু-এক টুকরো ফুলকপিও ছিলো—'

'এঁ্যা! ফুলকপি? ফুলকপি খেয়েছেন? এই তো আবার অত্যাচার হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। ক'টুকরো খেয়েছেন?' ডাক্তার তড়পাতে লাগলো।

'না গো, এক টুকরোও খাইনি।' ঠাকুর বললেন অপরাধীর মতো: 'তবে ঝোলে ছিলো দেখেছি।'

'দেখেছেন? তবেই হয়েছে! না খেলে কী হয়?'

'না খেলে কী হয়!' ঠাকুর অবাক হবার মুখ করলেন।

'কপি না খান, ঝোল তো খেয়েছেন? ঝোলে তো কপির গুণ ছিলো। তারই জন্যে তো আপনার মার হজমের ব্যাঘাত হয়ে ব্যারামের বৃদ্ধি হয়েছেন।'

'সে কি গো! ঠাকুর প্রায় আকাশ থেকে পড়লেন: 'কপি খেলাম না, পেটের অসুখও হয়নি, ঝোলে একটু-কি কপির রস ছিলো তাইতেই অসুখ বাড়লো? এ কিছুতেই মানতে পারবো না।'

'মানতে পারবেন না কেন?' ডাক্তার বসলেন গ্যাঁট হয়ে: 'আমার বেলায় কী হয়েছিলো শুনুন! হোমিওপ্যাথি করি, ছোটো-একটুকুর শক্তিকে উপেক্ষা করতে পারি না। আপনিই তো বলেছেন, ছোটো-একটুকু বীজে বিরাট বনস্পতি ছোট একটুকু নামে বিরাট বিশ্বঝঙ্কার! সেবার আমার দারুণ সর্দি হলো। সর্দি থেকে ব্রঙ্কাইটিস! কিছুতেই সারে না! কেন যে অসুখটা লেগে থকছে বুঝে উঠতে পারছি না কিছুতেই। শেষে একদিন দেখি কি—'

ঠাকুর তাকালেন কৌতূহলী হয়ে।

'দেখি, চাকর গরুকে মাষকড়াই খাওয়াচ্ছে। যে গরুটার আমি দুধ খাই সেই গরুটাকে। কি ব্যাপার? চাকর বললো কোত্থেকে কতোগুলো মাষকড়াই জুটেছে, সর্দির ভয়ে কেউ খেতে চাচ্ছে না, তাই ঠেসে-ঠেসে খাওয়াচ্ছে গরুকে। হিসেব করে দেখলাম, যেদিন থেকে মাষকড়াই খাচ্ছে গরু, সেদিন থেকেই আমার সর্দি।'

'তারপর কী করলেন?'

'গরুর মাষকড়াই খাওয়া বন্ধ করে দিলাম, আর আমার সর্দিও তাই সেরে গেলো!'

সবাই হেসে উঠলো হো-হো করে।

'কিসে কি হয় কিছু বলা যায় না।' আবার গল্প জুড়লেন ডাক্তার: 'পাকপাড়ায় বাবুদের বাড়িতে সাত মাসের মেয়ের অসুখ করেছিলো—ঘুঙরি কাশি, হুপিংকাফ। আমি দেখতে গিয়েছিলাম। কিছুতেই অসুখের কারণ ঠিক করতে পারি না। শেষে জানতে পারলাম, গাধা ভিজেছিলো।'

'গাধা ভিজেছিলো কি গো!'

'যে গাধার দুধ মেয়েটি খেতো সেই গাধা ভিজেছিলো বৃষ্টিতে।'

'সেই যে কি বলে গো ?' ঠাকুরও রঙ্গ করলেন 'সেই-যে বলে, তেঁতুলতলা দিয়ে আমার গাড়ি গিয়েছিলো কিনা, সেজন্যেই তো আমার অম্বল হয়েছে !'

পড়লো আবার হাসির রোল।

ডাক্তার বললেন, 'জানেন, একবার এক জাহাজের কাপ্তেনের বড়ো মাথা ধরেছিলো। তখন ডাক্তাররা পরামর্শ করে জাহাজের গায়ে বেলেস্তারা লাগিয়ে দিলো।'

শত চিকিৎসায়ও সারছে না ঠাকুরের অসুখ। শত যন্ত্রণায়ও ঠাকুর ছাড়ছেন না ঈশ্বরকে।

আরামেও রাম, ব্যারামেও রাম। যার ব্যাধি, তারই আরোগ্য। যার তিমিররাত্রি, তারই সুপ্রভাত। যে ঘাতক সেই বলি, সেই খড়্গ, সেই হাড়িকাঠ।

'দুঃখ জানে, শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থাকো—' ছন্দের মতো সুর করে বলে ওঠেন ঠাকুর।

যতোই দুঃখ আসুক, শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাক, তবু হে আমার মন, তুমি আনন্দে থাকো, ঈশ্বরকে ধরে থাকো। যতোই মেঘ আসুক, বিদ্যুৎ জ্বলুক, ঝড় লণ্ডভণ্ড করে দিক, তবু হে আকাশ, তুমি তোমার নীল কান্তিটি অম্লান রেখো। তোমার বজ্রে যেন তোমার বাঁশিটি শুনতে পাই। তোমার দাবদাহে অনুভব করি যেন তোমার শীতল প্রসাদ।

সিন্ধুদেশী ভক্তের নাম হীরানন্দ। বলছেন মাষ্টারমশাইকে : 'ওঁর কষ্ট আর দেখতে পাচ্ছি না। কেন উনি অতো কষ্ট সইছেন ?'

মাষ্টারমশাই বললেন, 'লোকশিক্ষার জন্যে।'

'কিসের লোকশিক্ষা ?'

'শুধু শেখাতে, দুর্বিষহ দৈহিক কষ্টের মধ্যেও কি করে ঈশ্বরে ডুবে থাকতে হয়। সকল কাঁটা ধন্য করে ফোটাতে হয় গোলাপ ! আসলে যাকে আমরা ভোগ বলি তাই হয়তো রোগ। আর যাকে আমরা রোগ বলি তাই হয়তো যোগ !'

'সত্যি, দেখছি সেই ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্টকে। কাঁটার মুকুট-পরা ভুবনেশ্বরকে।'

ঠাকুরকে এমন করে ভুগতে দিতে রাজি নয় দুর্গাচরণ।

একদিন তাকে কাছে ডেকে বসালেন ঠাকুর। ভাবাবেশে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, 'শুনেছো—শোনো, আমার অসুখ আর সারবে না কোনোদিন।'

'কে বললো ?' দুর্গাচরণ রুখে উঠলো।

'আমিই বলছি ! শোনো, ডাক্তারেরা হদ্দ হয়ে গেলো। কিছুতেই পারলো না সারাতে। তুমি পারো ?'

'পারি।' লাফিয়ে উঠলো দুর্গাচরণ।

'পারো ?'

'পারি।'

ঠাকুর বুঝতে পারলেন তার মনের কথা। ঠাকুরের ব্যাধি নিজের দেহে টেনে নিতে চায় দুর্গাচরণ।

তাকে পাশ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন ঠাকুর ? বললেন, 'জানি, তুমি পারো। কিন্তু থাক, সারিয়ে কাজ নেই।'

পরে বললেন একটু থেমে : 'আমার জন্যে ক'টা আমলকী আনতে পারো ?'

তাও পারে দুর্গাচরণ। লাফিয়ে উঠলো। তখুনি পড়ি-মরি ছুটলো আমলকী আনতে।

'কোথায় পাবে এখন আমলকী ?' কে একজন তাকে বাধা দিলো : 'এখন আমলকীর সময় নয়।'

দুর্গাচরণ তা গ্রাহ্য করে না। সময় হয়তো নয়, তাতে আমলকী পেতে বাধা কি। প্রভু যখন চেয়েছেন তখন মাটি ফুঁড়ে পাষাণ ফুঁড়ে আমলকী আসবে। যিনি মুককে বাচাল করেন, পঙ্গুকে করেন গিরিলঙ্ঘী, তিনি অকালফলোদয় ঘটাবেন আশ্চর্য কি ? আমার ব্যাকুলতাই নিয়ে আসবে আমার আকাঙ্ক্ষিতকে। অনাবৃষ্টির আকাশের

দিকে তাকিয়ে থাকবো আমার দৃষ্টির প্রাখর্যই ডেকে নিয়ে আসবে সেই শ্যামল-শোভন জলধরকে।

তিনদিনের মধ্যেই দুর্গাচরণ নিয়ে এলো আমলকী।

কিন্তু আমলকী খেয়ে তো গলার ঘা সারবে না।

তবে কিসে সারবে ?

সারবে, ভবতারিণীর কাছে স্পষ্টাস্পষ্টি প্রার্থনা করে।

নরেন তাই ঠাকুরকে পেড়ে ধরলো। বললো, 'এতো মা-মা করো, তোমার মার কাছে থেকে বর চেয়ে নিয়ে এসো, আমার গলার ঘা সারিয়ে দাও।'

'ওরে, শরীরের জন্যে কিছু চাইতে পারি না। শরীর তো নয়, কাপড়-মোড়া বাঁখারি। শুধু একটা বালিশের খোল।'

'ওসব কথা চাই না শুনতে। তোমার কষ্ট আর আমি যে দেখতে পারি না।'

'ওরে, যে মন একবার মাকে দিয়েছি সেই মন মার পাদপদ্ম থেকে তুলে এনে নিজের দেহের ওপর রাখতে পারি না।'

'রাখো। ওসব ঢের শুনছি।' নরেন প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো : 'তুমি কিচ্ছু খেতে পাচ্ছো না এই নিদারুণ দৃশ্য দেখা অসহ্য হয়ে উঠেছে। তুমি যাও, মার কাছ থেকে রোগমুক্তির বর চেয়ে নাও গে। মার কাছে এতো সঙ্কোচ কি ? সন্তানের মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এ মা-ই বা কি করে সহ্য করছেন ?'

প্রায় ঠেলে-ঠুলে জোর জবরদস্তি করে ঠাকুরকে পাঠালো নরেন। পাঠালো ভবতারিণীর মন্দিরে। বাইরে অপেক্ষা করে রইলো মাতা-পুত্রে কি কথা হয় তা জানবার জন্য।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলেন ঠাকুর।

'কি, বলেছিলে মাকে ?' নরেন ছুটে এলো উৎসুক হয়ে।

'বলেছিলাম !'

'কি বলেছিলে ?'

'বলেছিলাম, খেতে পাচ্ছি না—মুখ বন্ধ—'

'বলেছিলে? তাতে মা কী বললেন?'

'বললেন, তোর এক মুখ বন্ধ হয়েছে তাতে কি হলো। তুই তো শতমুখে খাচ্ছিস।'

মাথা হেঁট করে রইলো নরেন। নরেন যে খাচ্ছে—তাও তো ঠাকুরই খাচ্ছেন।

শুধু তাই কেন? যেখানে যে প্রাণী আহার করছে আস্বাদ করছে, সব আমি। ধরিত্রীর বুক থেকে রস টেনে নিচ্ছে গাছ, সে তো আমি। মা'র চঞ্চু থেকে খাদ্য সংগ্রহ করছে পক্ষীশাবক, সে তো আমি। আর আমিই তো সেই গহন কাননের মধুসন্ধানী মধুকর।'

'আমি অতো শতটত চাই না।' বলেছিলো বাবুরাম: 'আমি শুধু তোমার এই একখানি মুখ চাই। আমি চাই তুমি এই মুখটিতে খাবে আর আমি তোমার এই মুখটিই দেখবো।'

তোমার অভয়ময় আনন্দময় মুখ। এতো তোমার কষ্ট তবু এতো তোমার করুণা! এতো তোমার ক্লেশ তবু এতো তোমার আশ্বাস।

সমস্ত রোগের মালিন্যের ঊর্ধ্বে একটি আরোগ্যের কনককান্তি। সমস্ত যন্ত্রণার অবশেষে একটি উল্লাস উজ্জ্বল জয়ধ্বনি।

আমাদের চারিদিক আলোকময় করে আছো। যেদিকে তাকাই সেদিকেই তোমার তৃপ্তিভরা চক্ষু দু'টি দেখি- দেখি তোমার রুচির মুখের পবিত্রতা। গাছের ডালে নতুন জাগা পাতা ক'টি নাচছে, সে যেন তোমার আনন্দ! বাসা-না-ছাড়া পাখিরা কাকলী করছে, সে যেন তোমার সংবাদ! জলটি বয়ে যাচ্ছে কুলকুল করে, সে যেন তুমি ডেকে যাচ্ছো। মেঘ ছেঁড়া-রোদটি এসে গায়ে পড়েছে, সে যেন তুমি এসে ছুঁয়েছো বন্ধুর মতো।

এতো কষ্ট পাচ্ছেন তবু জীবের দুঃখে কাতর। সর্বক্ষণ জীবের মঙ্গল চিন্তা করছেন! তাকে নিমন্ত্রণ করছেন জগতের আনন্দযজ্ঞে।

'আহা, কি চিনিমাখা কথা!' বলছেন শ্যাম বসু।

'যে চিনিটুকু নিতে পারে সেই চতুর।' বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ : 'সংসারে বালিতে চিনিতে মিশেল হয়ে আছে। পিঁপড়ের মতো থাকো। বালি ত্যাগ করে চিনিটুকু নাও। বালির মধ্যে থেকে যে চিনিটুকু নিতে পারে সেই বাহাতুর।'

তেমনি সংসারে থেকে, সং-টুকু ছেড়ে দিয়ে সারটুকু নাও।

আমার ঘর ভরা। কতো জিনিস, কতো আসবাব। কতো বই খাতা, কতো পোশাক-আসাক। কতো লোকজন, গান-বাজনা। কতো হৈ-চৈ, হাসি-হুল্লোড়। কিন্তু ভরা ঘরে তোমাকে ছাড়া আমি ব্যর্থ। আমি হৃতসর্বস্ব।

ঠাকুর তখন কাশীপুরে গোপাল ঘোষের বাগান বাড়িতে। রোগ ক্রমশ বেড়ে চলেছে আগুনের মতো। যা বিক্ষত তাই বিশুদ্ধ—ক্ষত মুখে ঝরছে শুধু সুধাধারা। ক্ষুব্ধ স্তব্ধতা থেকে ঝরছে শুধু শান্তি। আর্তনাদ থেকে গীতকলকূজন।

শ্রীশ্রীমা সারদামণি এসেছেন ঠাকুরের সেবা করতে। দেবতার পূজার বেদীতে জাগ-প্রদীপটি হয়ে জেগে থাকতে। তুর্যোগের অমানিশাকে মঙ্গল দীপ্তিতে স্নিগ্ধ করতে।

একদিন তুধের বাটি নিয়ে উঠতে গিয়ে সিঁড়িতে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন শ্রীমা। তুধ তো গেলোই, মায়ের পায়ের গোড়ালির হাড় সরে গেলো।

'তাই তো বাবুরাম, এখন কি হবে!' ঠাকুর চিন্তিত স্বরে বললেন, 'যা হয় একটু কিছু খাইয়ে যেতেন, এখন কী উপায় আমার খাওয়ার!'

একেবারে সর্বার্পিতনির্ভর শিশুর মতো। একেবারে সরল শরণাগতি।

মা তখন নথ পরতেন। এরই মধ্যে মাকে নিয়ে ঠাকুরের রসিকতা, নাকের কাছে গোল করে হাত ঘুরিয়ে ঠারে-ঠোরে বলছেন ঠাকুর : 'ও বাবুরাম, ঐ যে—ওকে তুই ঝুড়ি করে মাথায় তুলে এখানে নিয়ে আসতে পারিস?'

ঠাকুরের কথা শুনে বাবুরাম আর নরেন তো হেসে খুন।

কিছুতেই কিছু হবার নয়। শ্রীমা তখন চললেন তারকেশ্বরে হত্যে দিতে।

একদিন যায়, তু'দিন যায়, পড়েই আছেন। তিনদিনের দিন রাতে একটা শব্দ পেয়ে চমকে উঠলেন শ্রীমা। যেন অনেকগুলো সাজানো হাঁড়ির উপর লাঠির ঘা পড়লো। সঙ্গে-সঙ্গে একটা ভাব এলো মার মনে। এ সংসারে কে কার? কার জন্য আমি এখানে হত্যে দিতে বসেছি? কাকে আমি বাঁচাবো? কার সাধ্য তাকে মারে?

মায়া কাটিয়ে মহান বৈরাগ্য এনে দিলো। অন্ধকার হাতড়াতে-হাতড়াতে মন্দিরের পিছনের কুণ্ড থেকে স্নানজল নিয়ে চোখে-মুখে দিলেন শ্রীমা। পিপাসায় গলা কাঠ হয়ে গিয়েছিলো। জল খেয়ে প্রাণ কিছু সুস্থ হলো। পরদিনই চলে এলেন।

'কি গো, কিছু হলো? জিগ্যেস করলেন ঠাকুর।'

মাথা নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন শ্রীমা।

ঠাকুর হাসিমুখে বললেন, 'কিছুই না। কিছুই না! ও আমি জানতাম। আমিও এদিকে স্বপ্ন দেখছিলাম, যেন ওষুধ আনতে হাতী গেলো। হাতী মাটি খুঁড়ছে ওষুধের জন্যে, এমন সময় গোপাল এসে স্বপ্ন ভেঙে দিলো!'

মা-কালীর কাছে এসে দাঁড়ালেন শ্রীমা। দেখলেন মা-কালী ঘাড় কাত করে রয়েছেন।

'মা, তুমি কেন অমন করে আছো?' শুধোলেন সারদামণি।

ঠাকুরের গলায় ঘা দেখিয়ে মা-কালী বললেন, 'ওর ঐটের জন্যে আমারও হয়েছে।'

ঠাকুর বললেন ভক্তদের, 'যা ভোগ আমার ওপর দিয়েই হলো। তোমাদের আর কাউকে কষ্ট ভোগ করতে হবে না। জগতের সকলের জন্যে আমি ভোগ করে গেলাম।'

আমাদের সকল তাপ তুমি হরণ করেছো, সকল পাপ, সকল গ্লানি।

সকল অহঙ্কার, সকল অগৌরব। ক্ষমা দিয়ে মুছে দিয়েছো সকল অক্ষমতা। দয়া দিয়ে ধুয়ে দিয়েছো সকল দারিদ্র্য। তোমার পাবন-মন্ত্রে জীবিত করেছো ভগ্ন আর রুগ্নকে জীর্ণ, আর জ্বরক্লান্তকে, পীড়িত আর অধোগতকে! তোমার স্পর্শে আমাদের তো শুধু উদ্ধার নয়, আমাদের উত্থান।

নরেন আর রাখাল পদসেবা করছে। মাষ্টারমশাইও কাছে বসে। নিরঞ্জন, শরৎশশী, বাবুরাম, যোগীন, কালী, লাটু, গোপাল সব আশে-পাশে, নীচে-উপরে। রাত দুটো। কারুর চোখে ঘুম নেই। নবমীর চাঁদ উঠেছে, কারুর মনে সুখ নেই। ঠাকুরের অসুখ আরো বেড়েছে। অসহায়ের মতো স্তব্ধ হয়ে আছে সকলে। যেন শত্রুসৈন্য অবরোধ করেছে নগরী---কিন্তু সবাই নিরস্ত্র বলহীন।

'তোমরা কাঁদবে বলে এতো ভোগ করছি।' বলছেন ঠাকুর, 'সবাই যদি বলো, এতো কষ্ট, দেহ যাক, তাহলেই দেহ যায়।'

কেউ কিছু বলছে না।

কিন্তু কেন, কেন এতো ভোগ? কেন এই দেহ-বিকার?

'জ্যোতির্ময় দেহ থাকলে লোকের ভিড় আরো বেড়ে যেতো।' বলছেন ঠাকুর, 'এখন বাইরে প্রকাশ নেই। তাই এখন আগাছারা পালাবে। আর যারা শুদ্ধ ভক্ত তারাই থাকবে এখন আমাকে ঘিরে এই ব্যারাম হয়েছে কেন? এর মানে ওই। যাদের সকাম ভক্তি তারা ব্যারাম অবস্থা দেখলে চলে যাবে।'

শুধু কি তাই?

ভক্তকুলকে বাঁধতে চাইলেন সেবার পুণ্যব্রতে! সেবার মধ্য দিয়ে সমপ্রাণতায় উদ্বুদ্ধ হতে।

আমরা সবাই তোমার সেবক। হে পরম সেব্য, তোমাকে সেবা করতে-করতে পরস্পরের প্রতি প্রীতিমান হবো। তোমার যখন শরণ নিয়েছি, হে মহাজীবন, হে মহামরণ, তোমার সঙ্ঘেরও শরণ নিয়েছি!

শুধু কি তাই?

আরো একটি অর্থ আছে।

তুমি যে আমাদেরই একজন, আমাদের যে তুমি ভোলোনি, আমাদের যে তুমি ত্যাগ করতে পারো না, এইটুকু বোঝাবার জন্যই তোমার এই রোগজ্বালা। তুমি এই ভুবন বিস্তীর্ণ সমস্ত পথ হেঁটে এসে উঠলে এ সংসারে? আমাদের পাশটিতে, আমাদের উত্তপ্ত নৈকট্যে। অন্তরবাসী হয়ে কি করে আবার প্রতিবেশী হতে হয় তারই সহজরূপে। বললে, আমি তোমাদেরই একজন, তোমাদেরই আপনার। চেয়ে দেখো আমার দিকে, রোগে বল নাও, শোকে সাহস নাও, আর মনে নাও ঈশ্বরানন্দমদিরা।

'দুঃখ জানে, শরীর জানে, মন তুমি আনন্দে থাকো।'

আর, তোমার যদি এই রোগ হতো, তবে, জগজ্জনকে কি করে দিতে তুমি আরোগ্যফল? কি করে তুমি কল্পতরু হতে?

ঈশ্বর অন্তরীক্ষ জুড়ে বৃক্ষের মতো বিরাজ করছেন—এ কথা শাস্ত্রে বলে। তুমি সে বৃক্ষের চেয়ে নিকটতর, নিবিড়তর! তুমি আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এসেছো! দিঙ্মণ্ডল ঢেকে মেলেছো তোমার শীতল ছায়া, তোমার আতপচ্ছদ। তুমি কল্পনার নও, তুমি মৃত্তিকার কল্পতরু।

১৮৮৬ সালের পয়লা জানুয়ারি! ঘোরতর অসুখের মধ্যে ঠাকুর হঠাৎ উঠে বসলেন। বললেন, 'আমার কাপড়-জামা দাও, আমি পরবো সাজবো, যাবো আমি বাগানে বেড়াতে।'

বেলা প্রায় তিনটে। ছুটির দিন বলে গৃহী-ভক্ত জড়ো হয়েছে বাগানে। যদি কোনো সুযোগে ঠাকুরের একবার দর্শন পায়।

গৃহীর টানে চললেন সেই মহাগৃহস্থ। সন্ন্যাসীর শিরোমণি হয়ে গৃহস্থের মধ্যমণি। সন্ন্যাসী সেবকেরা পড়ে রইলো ঘরের মধ্যে, আশে-পাশে, ঠাকুর চললেন মুক্ত মাঠে—গৃহস্থদের মাঝখানে।

আমি তোমাদের একজন। আমি তোমাদের ঘরের মানুষ। তোমাদের আত্মার আত্মীয়।

ঠাকুরের লালপেড়ে ধুতি পরনে, গায়ে সবুজ বনাতের জামা।

কাপড়ের টুপি দিয়ে কর্ণমূল ঢাকা। লতাপাতা-আঁকা মোজা পায়ে, চটিজুতো পরা।

সন্ন্যাসী সেবকরা সঙ্গ নিলো না। তারা ঘর-দোর বিছানা-বালিশ পরিষ্কার করতে বসলো! ঠাকুর চলে এলেন একা-একা।

চলে এলেন সংসারীদের এলাকায়। একেবারে পাপী-তাপী দুঃস্থ-দুর্গতদের দুয়ারে।

বসতবাড়ি আর ফটক, তারই মাঝখানে পশ্চিমদিকে সমাগত অতিথিরা ভিড় করেছে—গিরিশ ঘোষ, তার ভাই অতুল, রাম দত্ত, অক্ষয় সেন। আরো অনেকে।

ভাবানন্দে বিহ্বল হয়ে তাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন ঠাকুর। মৃত্তিকার ঘরে আকাশের দিনমণি।

সবাই হাতজোড় করে রইলো।

গিরিশকে সম্বোধন করে বললেন ঠাকুর, 'তুমি যে এতো সব বলে বেড়াচ্ছো, কি দেখেছো তুমি?'

'আমি আর কী বলতে পারি, প্রভু! হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে পড়লো গিরিশ। করজোড়ে উর্ধ্বমুখে বললো, 'ব্যাস-বাল্মীকি যার ইয়ত্তা করতে পারেনি, সেখানে আমি কি, আমি কতোটুকু!'

বরাভয়ে প্রসারিত হলেন ঠাকুর। উত্তোলিত হাতে সবাইকে আশীর্বাদ করলেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক।'

চৈতন্যের ঢেউ পড়ে গেলো। দেশ-কাল মুছে গেলো নিমেষে! ঠাকুরের আর ব্যাধি নেই, পঞ্চভূতের ফাঁদ থেকে যেন এসেছেন বেরিয়ে। প্রণামের হরির লুঠ পড়ে গেছে। স্পর্শাঞ্জলির অতৃপ্য তর্পণ। সবাই প্রতিজ্ঞা করেছিলো ঠাকুরের অসুখ না সারা পর্যন্ত কেউ ছোঁবে না তাঁকে—কেননা, সকলের স্পর্শ-কলুষেই তো ঠাকুরের এই রোগ—ভুলে গেলো সে-প্রতিজ্ঞা। কেশব সেন বলেছিলেন, ঠাকুরকে রেখে দিতে 'গ্লাস-কেসে'—ভেঙে গেলো সেই 'গ্লাস-কেস'। ঠাকুরও মহানন্দে ডুব দিলেন সেই স্পর্শ-সমুদ্রে। মৃত্যুঞ্জয়ী অভয় দিতে লাগলেন।

রাম দত্ত অঞ্জলি-অঞ্জলি ফুল দিতে লাগলো !

অক্ষয় সেনের হাতে দু'টি জহুরী চাঁপা। চাঁপা দু'টী তাঁর পায়ে দিতেই ঠাকুর তার বুক ছুঁয়ে দিলেন।

অক্ষয় একটা বিপুলতর চেতনার মধ্যে প্রাণ পেলো! সানন্দে চীৎকার করে ডাকতে লাগলো সবাইকে : 'ওরে, কে কোথা আছিস, এইবেলা চলে আয়। মুঠো-মুঠো অভয় কুড়িয়ে নে, আশ্বাস কুড়িয়ে নে। চৈতন্যের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। কুড়িয়ে নে ভারে-ভারে। জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি বিবেক—এমন দিন আর পাবি না রে! কৃপার পাত্র উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন প্রভু! আয়, নিয়ে যা, দেখে যা অর্জুন যেমন দেখেছিলো বিশ্বরূপ।'

ছুঁলেন নবগোপালকে, অতুলকে, হরমোহনকে। বৈকুণ্ঠ কিশোরী আর রামলালকে। হারাণের মহা-ভাগ্য, যেই প্রণাম করতে গিয়েছে, ভাবাবেশে ঠাকুর তার মাথায় পাদপদ্ম স্থাপন করেছেন।

কেউ স্তোত্র পড়ছে, কেউ বা ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছে, কেউ আবার ভাসছে চোখের জলে।

ওরে, আর লোক কই, বেলা যে বয়ে গেলো! কোথার কে আছিস আর্ত-বঞ্চিত অন্ধ-বিভ্রান্ত, আয় ছুটে আয়, কল্পতরুকে দেখে যা, বস এসে তাঁর ছায়ার আশ্রয়ে, তাঁর করুণার নিকেতনে। চতুর্বর্গ ফল নিয়ে যা। জীবনে যা তোর অভীষ্টতম সে পরম-ধন স্পর্শ কর্। লোহার কালো তনু কাঞ্চন করিয়ে নিয়ে যা।

রুটি বেলবার আয়োজন করছে রাঁধুনি বামুন, তাকে হিড়-হিড় করে টেনে আনলো গিরিশ।

'ওরে, কাতর প্রভু অকাতর হয়েছেন কৃপাবিন্দু নিয়ে যা পাত্র ভরে।'

রাঁধুনি-বামুনও কৃপা পেলো।

আর কোথায়! আর কোথায়!

হরিশ আছে। উপেন্দ্র আছে। তারাও এসে পড়েছে ঠিক সময়।

গুপ্তবেশে মহালীলা করে গেলাম। যারা সেদিন কাছে ছিলিনে,

ভয় নেই; ছি তোদের কাছটিতে। যারা সেদিন ছুঁতে পারিসনি, নে ামার এই অন্তর-স্পর্শ। যারা সেদিন দেখিসনি আমাকে, দেখ আজ তোদের মানস-দর্পণে।

আমি কল্পতরু। আমি ক্ষয়হীন করুণার উৎস।

বল কি তোর আকাঙ্ক্ষনীয়? নিজেকে কৃপণ মনে করে ক্ষুদ্র দরিদ্র মন নিয়ে কেন কোণে পড়ে আছিস? চা না, তোর যা ইচ্ছে। অন্তত আকাঙ্ক্ষায় উদার হ, অবারিত হ। নির্ভয়ে বল, কী তোর কামনার ন? যা চাইবি তাই পাবি। হিসাব করে চাইতে হবে না, প্রাণ ঢেলে, প্রাণ ভরে চা। চা—মুখ ফুটে।

'আমি কিছু চাই না। তোমার ফুল চাই না, ফল চাই না, শাখা চাই না। হে বৃক্ষ; আমি শুধু তোমাকে চাই।'

